মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ছোট প্রাণ ছোট কথা

ছোট প্রাণ ছোট কথা

ছোট প্রাণ ছোট কথা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

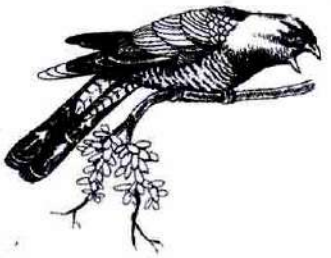

সূচিপত্র

এই সেই লজ্জাবতী ৭
মুসাফির পাখিদের কথা ১১
ঝিনুকের জীবন ১৬
শুঁয়োপোকা-কাহিনী ২০
সোনামণিদের খাবার ২৪
পাখি কেন গান গায় ২৮
কীটপতঙ্গের অনুভূতি ৩২
পশুপাখির আচরণ : যে বিজ্ঞান এখনো শৈশবে ৩৬
উইপোকা সাবধান ৪০
দৌড়, ভোঁ দৌড় ৪৩

এই সেই লজ্জাবতী

লজ্জাবতী নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনা অনেক দিনের। ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন চীনারা এ নিয়ে বিস্তর ভেবেছে। আর হবেই না বা কেন। স্পর্শকাতর উদ্ভিদের জগতে এই লজ্জাবতীর কাতরতাই যে সবচেয়ে বেশি। সামান্য ছোঁয়া পেলেই হল—এর পালকের মতো পাতাগুলো অমনি নুয়ে পড়ে। পাতার ফলকের যে-কোনো জোড়ায় ছুঁয়ে দিলে ওটা তো নোয়াবেই, সেইসাথে ছোঁয়ার খবরটুকু যেন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়ে পরপর পাতাগুলোকে নুইয়ে দিয়ে যায়। একটু জোরে ধাক্কা দিলে বোঁটাসহ পুরো পাতাটাই ঝুলে পড়ে। আর আঘাতে আহত করলে তো পুরো গাছের সব পাতা।

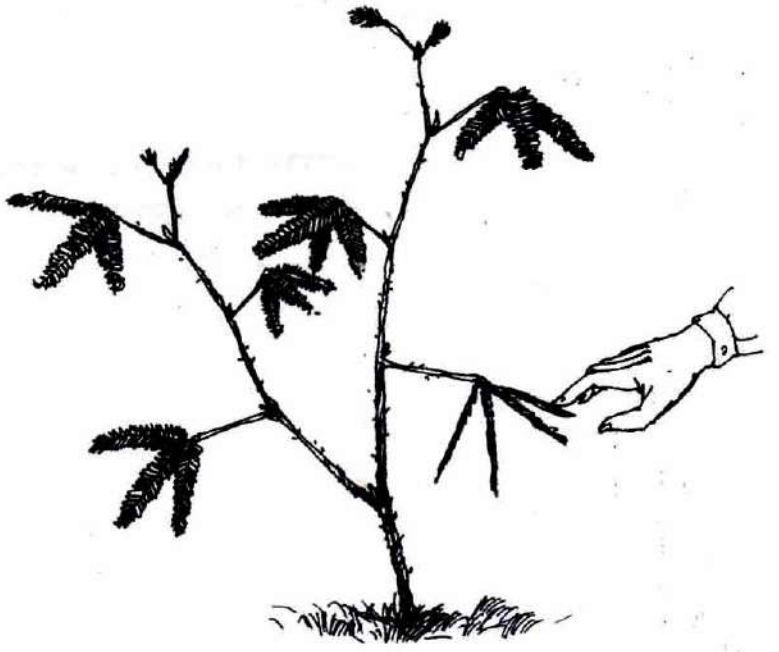

লজ্জাবতী শুধু স্পর্শে কাতর নয় ; আলো, উত্তাপ, ইলেকট্রিক শক, কাটা, পোড়া, এমনকি বায়ুচাপের পরিবর্তনেও সে কাহিল হয়। একে ক্লোরোফরমে অসাড় করে ফেলা যায়, এমনকি কফির ক্যাফেন প্রয়োগ করেও। লন্ডনের কিউ গার্ডেনের লজ্জাবতীর নাকি দর্শকদের বারবার স্পর্শের অত্যাচারে এমন নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল যে তার সব পাতাই ঝরে গিয়েছিল।

লজ্জাবতীর এবং স্পর্শকাতর অন্যান্য কিছু উদ্ভিদের উপর প্রথম সত্যিকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। অনুসন্ধানের ভিত্তি ছিল সূক্ষ্ম পরিমাপ। তিনিই প্রথম ১৮৯৩ সালে দেখিয়েছিলেন যে, এই স্পর্শকাতরতার নিয়ন্ত্রণটি রয়েছে বৈদ্যুতিক সিগন্যালের উপর। কাতরতার প্রবণতাটা যে সেকেন্ডে ১৪ মিলিমিটার বেগে পাতা বেয়ে অগ্রসর হয় এটাও তিনি মেপেছিলেন। এই বেগ সূক্ষ্মভাবে নিরূপণের জন্য জগদীশ বসু রিজন্যান্ট রেকর্ডার নামে একটি অতিসংবেদনশীল যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। এতে এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ে সংঘটিত পরিবর্তনও ধরা পড়ত।

স্পর্শকাতর উদ্ভিদের সাড়া সম্বন্ধে জগদীশ বসুর কাজগুলোই পথিকৃতের কাজ। তিনি দেখালেন উত্তেজিত করার পর লজ্জাবতী সাড়া দেয় এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশ সময়ে। এই উত্তেজনা বহনের যে গতি তাও আবার উষ্ণতার ওপর নির্ভরশীল। অসাড় করার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য প্রয়োগ করে যে এই উত্তেজক ধর্মটি নষ্ট করে দেয়া যায়, তাও তিনিই দেখিয়েছিলেন। এ সময় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে স্পর্শকাতর উদ্ভিদকে ছুঁলে বা আঘাত করলে এর পানির নলগুলোতে পানির চাপে যে তারতম্য হয় তা-ই চাপ বহন করে নিয়ে পত্রমূলে পৌঁছালে তার ফলে পাতা নুয়ে পড়ে। এই মতামতকে জগদীশ বসু সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার ধারণাটি প্রথম প্রবর্তন করেন।

কিন্তু এই বৈদ্যুতিক উত্তেজনার কারণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা তখনই শেষ হয়ে যায়নি। লজ্জাবতী জাতীয় উদ্ভিদে প্রচুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, প্রতিটি পাতার তলার বা বোঁটার গোড়ায় একধরনের প্যাডের মধ্যেই এর ওঠানামার সূত্র রয়েছে। এই প্যাডগুলোর অর্ধাংশে উত্তেজনা এসে পৌঁছালে তাতে পানি ভর্তি হয়ে বা তার থেকে পানি বেরিয়ে গিয়ে এর আকৃতি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে ঐ প্যাডটি খানিকটা স্থানান্তরিত হয়ে পুরো পাতাটাই ঠেলে বা টেনে দেয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, পানির এরকম আসা-যাওয়ার চালকশক্তি এখানকার কোষ ঝিল্লির মধ্য দিয়ে পটাশিয়াম ও সম্ভবত ক্লোরাইড আয়নের পরিবহণের মধ্যে নিহিত। এই পরিবহণের সূত্রপাত করে আবার বৈদ্যুতিক সিগন্যাল। অবশ্য সেটি ঠিক কীভাবে ঘটে তা এখনো অজানা।

লজ্জাবতীর পাতা নোয়াবার এই ব্যাখ্যার সাথে গাছপালার একটি অতিসাধারণ ঘটনার আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। সব গাছের পাতার তলার পিঠে অনেকগুলো ছোট ছোট ছিদ্র

থাকে যাদের পত্ররন্ধ্র বলা হয়। এই ছিদ্র প্রয়োজনমতো বড়-ছোট হতে পারে আর এর মধ্য দিয়েই গাছের পাতায় বাইরে থেকে গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প আসে যায়। পত্ররন্ধ্রগুলো পরিবেশের নানারকম সংকেতের ওপর নির্ভর করে নিজেকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে—যেমন আলোর তীব্রতা, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতি। ছিদ্রের দু'পাশের দুটি সংবেদনশীল 'দ্বার-রক্ষী কোষের' পানি নিয়ে বা ছেড়ে বড়-ছোট হবার মাধ্যমেই ছিদ্র নিয়ন্ত্রিত হয়। আর দেখা গেছে এই ক্ষেত্রেও পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়ন পরিবহণ এটা নিয়ন্ত্রণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবারা পিকার্ড-এর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল লজ্জাবতীর সংবেদনশীলতার ওপর প্রচুর কাজ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, টম্যাটো এবং অন্যান্য কিছু উদ্ভিদের দেহকে আহত করলে তার সারা কাণ্ডে এমন একটা বৈদ্যুতিক সিগন্যাল ছড়িয়ে পড়ে যা অনেকটা লজ্জাবতীর সিগন্যালেরই অনুরূপ। এই সিগন্যালের ফলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়—যার ফলে আহত গাছের পানি সংরক্ষিত হয়। এভাবে বৈদ্যুতিক সিগন্যালতাড়িত হয়ে বিশেষ নিয়ন্ত্রক কোষের পানি গ্রহণ বা ত্যাগের উদাহরণ আরো দেখা গেছে।

বৈদ্যুতিক সিগন্যালের মাধ্যমে উত্তেজনা স্থানান্তরিত হয়ে যদি সংবেদনশীলতার সৃষ্টি করতে পারে—তবে তাকে কি আমরা উদ্ভিদের 'স্নায়ু' বলব? জগদীশ বসুর আমল থেকেই শব্দপ্রয়োগের এই সমস্যাটি আমরা অনুভব করে আসছি। জগদীশ বসুর নিজের লেখায় গাছের এই সংবেদনশীলতাকে স্নায়বিক অনুভূতি হিসেবে অনেকটা প্রাণিজগতের মতো করে নেবার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু আরেকজন বিজ্ঞানী ফন সাখ্স বহু দিন আগে মত প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু উদ্ভিদের এই সিগন্যাল বহনকারী কোনো বিশেষ ধরনের স্নায়ুতন্ত্র নেই—কাজেই একে স্নায়ু বলা ঠিক হবে না। আসলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণ দেহকোষের মাধ্যমেই সিগন্যাল যায়। লজ্জাবতীতে পানি ও খাদ্য বহনকারী নলের নিকটবর্তী কিছু কোষের মাধ্যমেই এটা পরিবাহিত হয়। সিগন্যালের প্রকৃতির দিক থেকে প্রাণীর সাথে মিল আছে কিন্তু বাহক-কোষের দিক থেকে মিল নেই ; বরং সেটা এতই সাধারণ গোছের যে, তাকে স্নায়ু বলতে অনেকের আপত্তি। তা ছাড়া গাছের চেতনা রয়েছে—এমন কথা ওভাবে আজকাল আর কেউ বলবে না। বরং আজকের সমস্যা হচ্ছে বিদ্যুৎ-মাধ্যমে যে উত্তেজনা বাগানের আরো সাধারণ নানান উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার স্বরূপ নির্ণয় করা।

বারবারা পিকার্ড-এর গবেষণার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন তাঁরা অনেক পুরোনো একটি আবিষ্কারকে খতিয়ে দেখছেন। ১৯১৬ সালে উলরিখ রিক্কা লজ্জাবতীর মধ্যে একটি বিশেষ হরমোন আবিষ্কার করেন। পিকার্ড দেখেছেন যে, এই হরমোনটিই

আঘাতজনিত বৈদ্যুতিক সিগন্যালের সৃষ্টি করে। এখন এই হরমোনটির গঠন ও কার্যপ্রণালী বোঝার জন্য কাজ চলছে। যদি সেটা জানা সম্ভব হয় তা হলে উদ্ভিদ-সংবেদনশীলতার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ আনাটাও হয়তো কঠিন হবে না। এই সংবেদনশীলতার শুধু লজ্জাবতীর নুয়ে পড়াতেই প্রাসঙ্গিক হবে তা নয় ; বরং গাছের কাটা অংশের পূর্ণ বৃদ্ধি, ফুল-ফলের বিকাশ এবং এমনকি হয়তো স্বাভাবিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে আমরা আবিষ্কার এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

মুসাফির পাখিদের কথা

শীতের এক-একটা দিনে পদ্মার কোনো চরে হয়তো বসেছে অসংখ্য পাখির মেলা। দু'দিন পরেই ওরা আবার সেখানে নেই। ওরা মুসাফির পাখি। এসেছে সুদূর উত্তর থেকে। ওখানে ওব নদীর পারের দেশে হয়তো কেটেছে ওদের গরমকাল। তারপর কিসের মোহে জানি ডানা মেলেছে এরা। মাঝখানে ওদের হয়তো একদিন দেখা গেছে মধ্যএশিয়ার প্রান্তরে, আবার মানস সরোবরের উপরে, আবার হিমালয় পেরিয়ে এই এখানে। কেন ওরা প্রতি বছর আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, কেন পছন্দ করে নেয় এক-একটা জায়গা, কেনই-বা আবার সেখান থেকে চলে যায়? এই ছোট্টদেহী নিরীহ প্রাণীগুলোর পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয় সমতল, পর্বত আর জলরাশির উপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে যাওয়া—বছরে দুই-দুইবার?

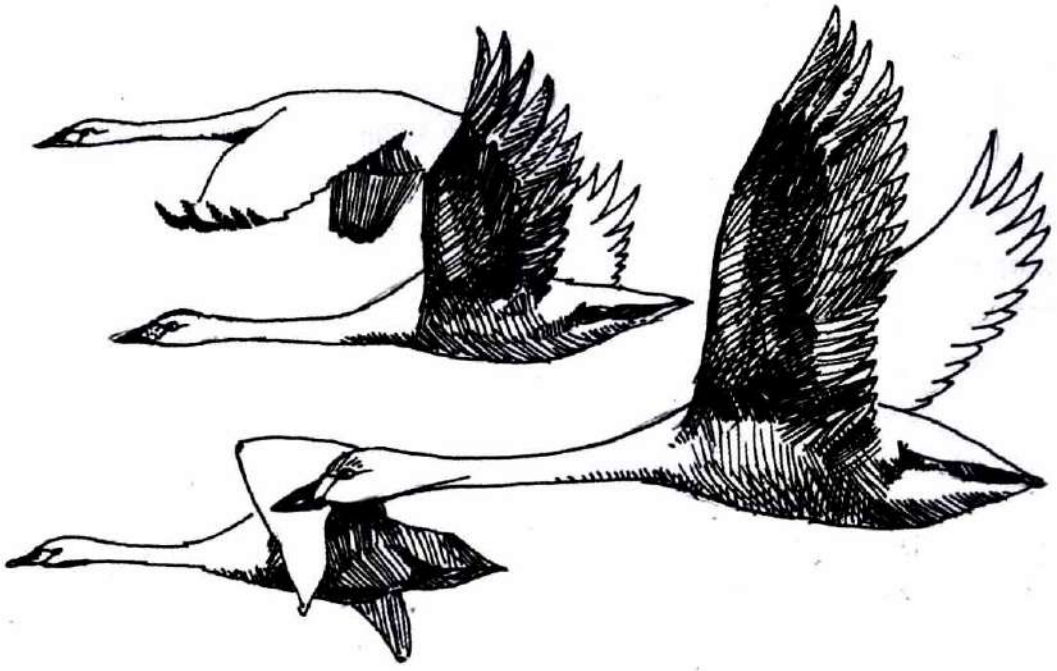

মুসাফির পাখিদের জগতে বহু আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশ ঘটে থাকে। গত বছর শীত কাটিয়েছে যেখানে এবারের শীতের জন্যও ঠিক ঐ জায়গাটিকেই বেছে নিতে তাকে দেখা যায়। আবার শীতের শেষে তার উত্তরের যাত্রার পর এই পাখি ফিরে যায় যেখান থেকে এসেছিল ঠিক সেখানে, এমনকি অনেক সময় ঠিক সেই গাছটিতে। কানাডার একটা ছোট্ট পাখি ব্ল্যাকপোল ওয়ার্বলার শরতের দিকে উড়ে আসে আটলান্টিকের তীরে। সেখান থেকে পাকা ২,৩০০ মাইল পথ এটা আটলান্টিকের উপর দিয়ে একটানা ৮৬ ঘণ্টায় উড়ে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে। সবচেয়ে অবাক করে দেয় আর্কটিক টার্ন নামক পাখিগুলো। এদের অনেকের জন্ম উত্তরমেরু থেকে সাড়ে চারশো মাইলের মধ্যে। আর এরা সবাই উড়ে যায় সাড়ে বারো হাজার মাইল সোজা দক্ষিণে আন্টার্কটিকাতে দক্ষিণমেরুর কাছে।

এরকম পর্যটনে কত পাখি শরিক হয়? ১৯৭৭ সালে একটি পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এটা নির্ণয়ের চেষ্টায়। রেডার আর টেলিস্কোপের সাহায্যে মুসাফির পাখির একটি পর্যটন-পথের পঞ্চাশ মাইল চওড়া একটা জায়গা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ওখান দিয়ে পাঁচ কোটি পাখি পার হয়ে গেছে।

কিসের ধান্দায় পাখিরা দেশান্তরি হয়? সহজ উত্তর হবে শীত এড়াতে আর খাবারের প্রাচুর্যের খোঁজে। কিন্তু দেখা যায় ভালো আবহাওয়া আর ভালো খাবারের দেশে এসে গিয়েও পাখিরা থামে না—যেতে থাকে আরো। হয়তোবা আজ পাখিদের আসা-যাওয়ার যে প্যাটার্ন তার বংশগতিতে এটা মজ্জাগত হয়েছে সুদূর অতীতে ; বহু শীত, বহু বসন্তের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অতীতে শীতের দেশের সীমা আজকের মতো ছিল না। যুগ-যুগান্তরের অভ্যাসবশত পাখি অতীতের প্রয়োজনকেই হয়তো আজও বজায় রেখে চলেছে।

কিন্তু শীতের প্রকোপ বা খাবারের অভাব অনুভূত হওয়ার অনেক আগে থেকেই পাখিরা ডানা মেলে সুদূরের উদ্দেশে। এর মূলে রয়েছে তাদের আলোকসংবেদিতা। শরতে দিনের আলোর স্থায়িত্ব কমে এলেই পাখির হরমোনের গ্রন্থির ওপর এর প্রতিক্রিয়া হয়, আর সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিগ্‌গির সে বুঝতে পারে যাত্রার সময় সমাগত। তেমনি বসন্তে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়লেও একই ব্যাপার ঘটে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইলের পর মাইল ওড়ার উপযুক্ত করেই তৈরি পাখির শরীর। তার শরীরের আয়তনের তুলনায় ডানার গোড়ায় যে মাংসপেশি সেটি অত্যন্ত সুগঠিত। শক্তি যোগানের জন্য পাখির শ্বাসপ্রশ্বাস-ব্যবস্থাও অদ্ভুতভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এর ফুসফুসের রক্ত আর বাতাস পরস্পরের দিকে এমনভাবে ধাবিত হয় যে, বাতাস থেকে তার অক্সিজেন গ্রহণের দক্ষতা অন্য যে-কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। দেশান্তরি হবার আগে অনেক পাখি শরীরে বেশ পুরু কয়েক স্তর চর্বির যোগাড় করে নেয়। এ যেন লম্বা উড্ডয়নের জন্য বিমানের মতো একসাথে বেশি করে জ্বালানি নিয়ে নেয়া।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল মুসাফির পাখিরা হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পথ যেভাবে মুখস্থ রাখে ; কেমন করে যেন ঠিক পথ চিনে তারা চলে যেতে পারে ! আগে মনে করা হত প্রধানত বিভিন্ন পরিচিত পথচিহ্ন দেখে দেখেই এরা পথ চিনতে পারে। প্রয়োজনে কোনো কোনো পাখি ঠিকই দিনের বেলায় পথচিহ্নের সহায়তা নিয়ে থাকে। সমুদ্রতীর, নদী, পর্বতমালা এসব তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে, এরাই পাখির পথ চেনার বড় কারণ নয়।

যদি পথচিহ্নটাই বড় হত, তা হলে নীড় থেকে দূরে নিয়ে ছেড়ে-দেয়া পাখির পক্ষে আবার ঠিক পথে ফিরে আসা সম্ভব হত না। অচেনা জায়গায় সহজেই সে বিভ্রান্ত হত। কিন্তু তা হয় না। একবার ওয়েলসের কাছের একটা দ্বীপের কিছু পাখিকে দুনিয়ার নানা জায়গায় ছেড়ে দিয়ে দেখা গিয়েছে যে এরা সবাই বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে। সমুদ্রের আকাশে বিচরণে অভ্যস্ত এই পাখির স্থলের পথচিহ্ন চেনার কথা নয়, কিন্তু দেখা গেছে ভেনিস থেকে ছাড়া এরকম পাখি আল্পস পর্বতের উপর দিয়ে ফ্রান্স পার হয়ে সোজা চলে গেছে তার বাড়ির পথে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ এই দশ বছর ধরে একটা চমৎকার পরীক্ষা করা হয়। এতে ১১,০০০ স্টার্লিং পাখিকে নেদারল্যান্ড থেকে ধরে ওখানে তাদের পায়ে চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়। এই পাখিগুলোকে অনেক দক্ষিণে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়া হয়। এই পাখিরা সাধারণত নেদারল্যান্ডস থেকে গিয়ে ব্রিটেনের দক্ষিণে এবং ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে শীতকালটা কাটায়। দেখা গেল বয়স্ক পাখিগুলোর বেশির ভাগই ঐ দক্ষিণে স্থানান্তরিত হওয়াটা ঠিক বুঝে ফেলেছে এবং ভুলটা শুধরে নিয়ে সোজা চলে গেছে তার স্বাভাবিক শীতকালীন বিচরণক্ষেত্রে। কিন্তু অল্পবয়সী পাখিরা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে বংশগতভাবে পাওয়া ভ্রমণের দিকটাই বরং ঠিক রেখেছে—ফলে ঐদিকে উড়ে গিয়ে তারা দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনে গিয়ে নূতন বিচরণক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। পরীক্ষাটি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে দিকজ্ঞানটা বংশগতভাবে পাওয়া, কিন্তু বয়সের সাথে সাথে পাখি অধিকারী হয় যেন চমৎকার এক কম্পাসের যার সাহায্যে সে নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে গেলেও সেটা শুধরে নিতে পারে।

কী যে এই কম্পাস, তা আবিষ্কারের জন্য বহুরকম পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এরকম একটি পরীক্ষায় কিছু স্টার্লিং পাখিকে গোল একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয়েছিল যার স্বচ্ছ তলার মধ্য দিয়ে এদের দেখা যেত। দেহে বসন্তের চাঞ্চল্য যখন লাগল তখন দেখা গেল পাখিগুলো তাদের পর্যটনের দিক অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে আছে, আবার শরতের সময় ঠিক তার উলটো—দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এবার খাঁচার চারদিক এমনভাবে ঢেকে দেয়া হল যেন শুধু সূর্যালোক ছাড়া আর কিছুই দেখা না যায়। এবারও পাখির দিকগুলো

ঠিক রইল। আয়নার সাহায্যে সূর্যালোক পড়ার দিকটি ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়ে দেখা গেল পাখির অভিমুখিনতাও ৯০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে। বোঝা গেল সূর্য পাখিকে দিঙ্‌নির্ণয়ে সহায়তা দিচ্ছে।

রাতের আকাশে তারারাও কি পাখিকে দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্য করে? এটা বোঝার জন্য খাঁচায় পাখি নিয়ে পরীক্ষা করা হল যাতে করে শুধু রাতের আকাশ পাখির জন্য উন্মুক্ত থাকে। তাতেও পাখির অভিমুখিনতা ঠিক রইল। কিন্তু বিশেষ বিশেষ তারা যদি পাখির আড়াল করে ফেলা হয় অমনি সবকিছু গুলিয়ে যায়। আরো মজার ব্যাপার— প্লানেটোরিয়ামে ক্ষণিকে শরতের আকাশ, ক্ষণিকে বসন্তের আকাশ সৃষ্টি করে পাখির আচরণ লক্ষ করে দেখা গেল তারার অবস্থানগুলো যখন শরতের আকাশের মতো তখন পাখি উড়ছে উত্তর-পূর্ব দিকে, আবার তারাগুলো যখন বসন্তের আকাশের মতো এরা যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। তা হলে রাতের আকাশের তারা দেখেও মুসাফির পাখিরা পথ চিনে থাকে। শিগ্‌গির আরো বোঝা গেল যে, তারা দেখার দিগ্‌জ্ঞানটি পাখির জন্মগত নয়, এটা তাকে ধীরে ধীরে জেনে নিতে হয়।

তারা আর সূর্য দেখে পাখি শুধু কম্পাস-দিকগুলো নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু এতে চলাচলের সব সমস্যার সমাধান হল না। ঠিক পথে এগুতে হলে প্রতি মুহূর্তে নিজের অবস্থানটিও জানা থাকা চাই। একমাত্র তখনই শত শত মাইল স্থানান্তরিত হয়েও পাখি ঠিক বুঝতে পারবে এবার তার কোন দিকে যাওয়া চাই। বিজ্ঞানীরা এখন পাখির এই ক্ষমতার তিন ধরনের কারণ চিহ্নিত করেছেন। এক, পরিচিত পথচিহ্ন দেখে ; দুই, একটি বিশেষ দিক ঠিক রাখার ক্ষমতা এবং যত অজানা জায়গাতেই হোক-না কেন সেই দিকটি বজায় রাখা ; তিন, তার লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছার জন্য সঠিক দিকটি নির্ণয়ের ক্ষমতা, তাকে যেখানে নিয়েই ছেড়ে দেয়া হোক-না কেন।

তৃতীয় ক্ষমতাটাই সবচেয়ে জটিল ও বিস্ময়কর। অনেকে মনে করেন এর জন্য পৃথিবীর চৌম্বকত্বের ব্যাপারে পাখির সংবেদিতা দায়ী। কোনো কোনো পাখিকে খাঁচার ভেতর আকাশের দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ আড়াল করেও দেখা গেছে এর শরৎ ও বসন্তকালীন অভিমুখিনতা ঠিক থাকছে। কিন্তু বিদুৎবাহী কয়েলের দ্বারা খাঁচার ভেতর চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে এর স্বাভাবিক ভূচৌম্বক দিকগুলো পরিবর্তিত করে দিলে পাখির দিগ্‌জ্ঞান আর থাকে না। পরীক্ষার ফলে আরো দেখা গেছ যে, আসলে পাখি মাধ্যাকর্ষণের খাড়া দিকের সাথে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের লাইনগুলোর মধ্যকার কোণ খুব সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারে। এর সাহায্যেই এরা বুঝতে পারে কখন কোনদিকে যেতে হবে।

দিঙ্‌নির্ণয়ের ব্যাপার ছাড়াও পাখির অদ্ভুত সব ক্ষমতা রয়েছে। কোথায়, কত উপরে গেলে অনকূল বাতাস পাওয়া যাবে তা জানার ও সেই বাতাসকে সুদক্ষভাবে ব্যবহারের

সুন্দর ক্ষমতা এর আছে। আকাশে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়ার অনেক আগেই কোনো কোনো পাখি আবহাওয়া-বদলের খবর জানতে পারে। দেখা গেছে যে, কবুতররা বায়ুচাপের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তনও বুঝতে সক্ষম। চোখের দৃষ্টিও তাদের উন্নততর। পোলারিত এবং অতিবেগুনি রশ্মিও কবুতরের চোখে সাড়া জাগায়।

খুব দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যেসব শব্দ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বহু দূর চলে যেতে পারে পাখিরা সেগুলোও শুনতে সক্ষম। কাজেই একটা মুসাফির পাখি যখন উত্তরবঙ্গে যমুনা ধরে এগুচ্ছে তখন হয়তো তার কানে আসছে হিমালয়ের ওপরের বজ্রবৃষ্টি, বঙ্গোপসাগরের ঝোড়ো ঢেউয়ের শব্দ, এমনকি বহু উপরের বায়ুমণ্ডলে আয়নমণ্ডলের ছন্দিত ধ্বনি।

মুসাফির পাখিরা আমাদের কাছে এমন বিস্ময়, কারণ ওরা আমাদের মতো একইভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাসিন্দা নয়। তাই পদ্মার চরে বা হাওরের তীরে যখন আমরা ওদের দেখি, আমাদের তখন অবাক হয়ে ভাবা উচিত পাখিজগতের নানা ক্ষমতার বিশাল বিস্তৃতির কথা। আমাদের এই মেহমানরা ফি-বছর আসে একাধিক অর্থে ভিন জগতের খবর নিয়ে। আমাদের তরফ থেকে ওদের যেন কোনো অযত্ন না হয়।

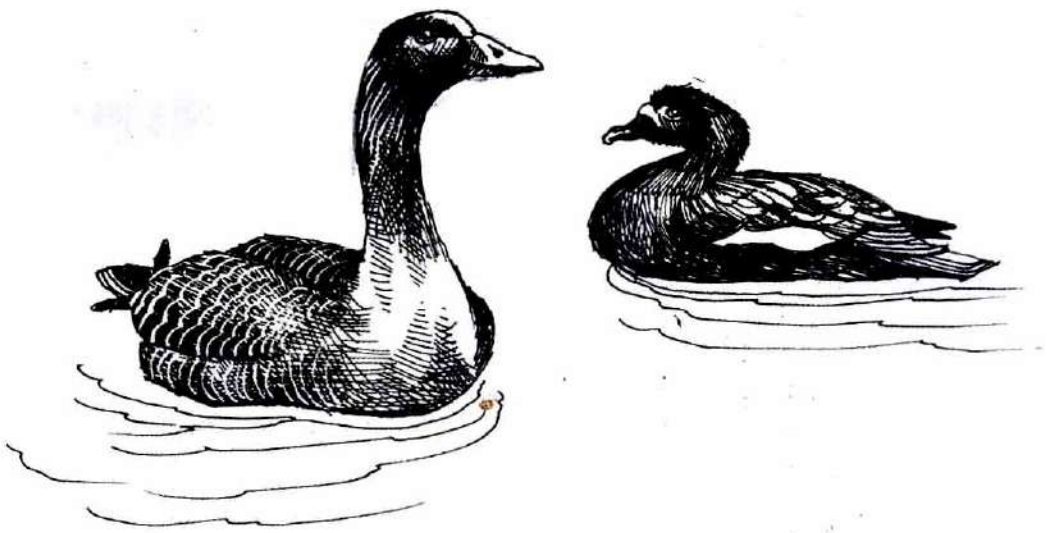

ঝিনুকের জীবন

তুমি যখন ঝিনুক দেখ, তখন খুব সম্ভব ঝিনুকের খোলাটাই দেখ। কিন্তু ভুলে যেও না একদিন এই ঝিনুক সজীব একটি প্রাণী ছিল যার প্রায় পুরোটা জীবন কেটেছে পানির তলায় কোনো শক্ত জিনিসের সঙ্গে নিজেকে আটকে নিয়ে। এভাবে তার পাঁচ-ছয় বছরের জীবন ঐ জায়গাতেই কেটে যায় যদিনা সে কোনো শত্রুর হাতে পড়ে। কোনো কোনো ঝিনুক এভাবে ২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

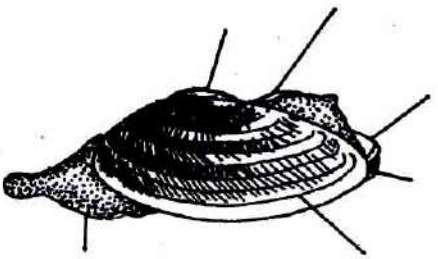

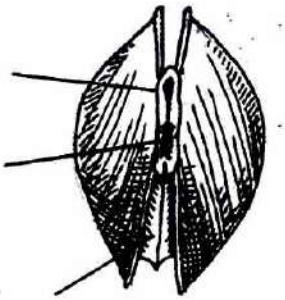

বছরের পর বছর এভাবে এক জায়গায় আটকানো অবস্থায় কাটালেও ঝিনুকের জীবনের প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ কিন্তু কেটেছে পানির মধ্যে খোলামেলা ঘুরে বেড়িয়ে। বলতে পার নিতান্ত শিশু অবস্থাই ঝিনুকের খেলে বেড়াবার সময়। তারপর—বাকি সারাটা জীবন সে শুধু নিজেকে এক জায়গায় আটকে নিয়ে সামনে যা পড়েছে তা খেয়েছে আর বড় হয়েছে মাত্র।

মা-ঝিনুক যখন ডিম পাড়ে তখন কোটি কোটি ডিম একসঙ্গে হলুদ ক্রীমের রূপে পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। দশ ঘণ্টা পরে ডিম থেকে বাচ্চা বেরুলে প্রতিটি বাচ্চা আকারে হয় ছুঁচের মাথার সমান আর আকৃতি হয় অনেকটা একটি লাটিমের মতো। এর সঙ্গে থাকে সরু

চুলের মতো জিনিস যার সাহায্যে শিশু-ঝিনুক সাঁতার কেটে বেড়ায়। চুলগুলোকে চাবুকের মতো পানিতে চালনা করে সে সামনে এগিয়ে যায়। ঝিনুকের প্রথম দিনটিতে সে থাকে খোলসহীন নরম দেহের, কিন্তু প্রথম ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরপরই তার খোলসতৈরির কাজ শুরু হয়।

এভাবেই দুই সপ্তার মতো ঝিনুক-শিশুর সাঁতার কেটে ঘুরেফিরে কেটে যায়। এ সময় পায়ের মতো একটি মাংসল অংশ তার দেহ থেকে বের হয়ে থাকে। এই পা-টি দিয়ে বাচ্চা-ঝিনুক পানির তলায় শক্ত নানা জিনিস ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, পরীক্ষা করে দেখে বাকি জীবন কাটাবার জন্য এ জায়গায় সে নিজেকে আটকিয়ে নিতে পারবে কি না। অবশেষে যুতসই একটি পাথর, অন্য কিছুর খোলস, বা শক্ত যে-কোনো কিছু পেলে সে নিজের খোলসটি এর সঙ্গে আটকে নেয়। এভাবে সে অন্য ঝিনুকের খোলসের সঙ্গেও আটকে নিতে পারে। এর পর তার মাংসল পাখানি আস্তে আস্তে চলে যায়।

ছোটবেলায় ঝিনুক বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে। প্রথম মাসের পর এটি একটি ছোট মটরশুঁটির দানার আকারের হয়। এক বছর বয়সে আড়াই সেন্টিমিটার মোটা হয়। এর পর তিন-চার বছর ধরে তিন সেন্টিমিটার মতো করে বড় হয়ে পরে তার বাড়ার হার কমে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঝিনুক ২০-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হতে পারে।

বয়স হবার পর ঝিনুকের খোলসটা বেশ শক্ত মোটা হয়ে ওঠে। এর দুটা ভাগ। একটি বড় যার মধ্যে ঝিনুকের শরীরের নরম অংশগুলো থাকে। খোলসের অন্য ভাগটি প্রথমটির সঙ্গে এক দিকে কবজার মতো ব্যবস্থায় আটকানো থাকে, ঢাকনির মতো বন্ধ হয়ে দেহকে ঢেকে রাখতে পারে, আবার খুলেও রাখতে পারে। সাধারণত ঝিনুক খোলসের দুই ভাগ একটুখানি ফাঁক করে রাখে। কিছু দেখলে সে এই দুটি শক্ত করে আটকে দিয়ে এর ভেতর আত্মরক্ষা করতে পারে। এভাবে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে থাকলেও তার ক্ষতি হয় না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খুলতে হলে যথেষ্ট জোর খাটাতে হয়।

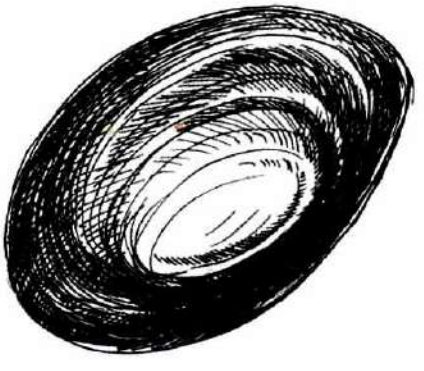

খোলসের ভেতরের দেয়ালে থাকে একটি মাংসল স্তর—এখান থেকে রস বের হয়ে তা শক্ত হয়ে খোলস তৈরি হয়। অন্যান্য নরম অংশের মধ্যে রয়েছে নিশ্বাস নেবার ফুলকা, খাওয়ার মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র, হার্ট ইত্যাদি। ফুলকার আর একটি কাজ হল পানির ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীকে এর সাথে আটকিয়ে নিয়ে মুখের দিকে ঠেলে দেয়া। এরাই ঝিনুকের খাদ্য। হার্ট থেকে রক্ত ঝিনুকের সারা শরীরে যায়।

ঝিনুকের কিন্তু চোখ, কান, বা নাক নেই—কাজেই তারা দেখতে, শুনতে বা শুঁকতে পারে না। তবে লোমের মতো সরু কতগুলো অঙ্গের সাহায্যে এরা আশপাশের কোনো কোনো ঘটনা বুঝতে পারে। এভাবেই বিপদের সম্ভাবনা বুঝে ঝিনুক তার খোলসের দুভাগকে শক্ত করে আটকে দেয়। ঝিনুকের শত্রু কারা? মানুষই বোধহয় সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ খাদ্য হিসাবে, এর খোলসের জন্য আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায় বলে মানুষ সব সময় ঝিনুক সংগ্রহ করছে। তা ছাড়া বড় মাছ, কাঁকড়া ও পানির অন্যান্য প্রাণীও ঝিনুক খেতে খুব পছন্দ করে। তাই খোলসের মধ্যে লুকিয়ে গা বাঁচানো ছাড়া ঝিনুক বেচারা আর কীইবা করতে পারে।

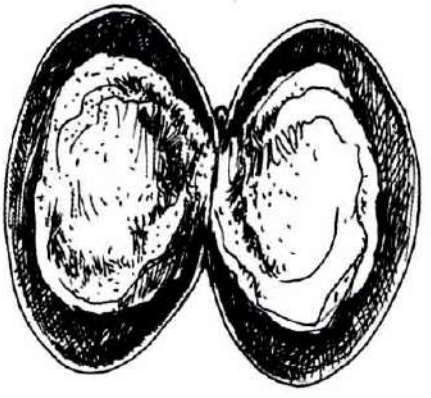

ঝিনুকের মাংস মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য। এটি বেশ দামি ও উপাদেয় খাবার হিসাবে বিবেচিত হয়। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে ৩ কোটি কিলোগ্রাম ঝিনুক ধরা হয় খাবার জন্য। এত বেশি ঝিনুক দরকার হয় বলে অনেক দেশে ঝিনুকের চাষও করা হয় সমুদ্রের পানিতে। অগভীর শান্ত সমুদ্রের তলায় ঝিনুক আটকাবার মতো শক্ত বিছানা তৈরি করে দিয়ে এসব ঝিনুকের খামার সৃষ্টি করা হয়। এই খামার থেকে প্রচুর পরিমাণ ঝিনুক প্রতি বছর শীতকালে তুলে আনা হয়। মৃদু উষ্ণ সমুদ্রের পানিতেই এই চাষ সবচেয়ে ভালো হয়।

ঝিনুককে যখন মানুষ তুলে আনে ঝিনুক কিন্তু সহজে হাল ছাড়ে না, কিছুতেই তার খোলসের বাক্স খোলে না। বেশ কৌশলে এবং বল প্রয়োগ করে তাকে খুলতে হয়। কাঁকড়া প্রভৃতি শত্রুদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এই কাজে। ঝিনুক খায় এমন একরকম শামুক

আছে যাদের রয়েছে ঝিনুকের খোলস ছিদ্র করার জন্য ড্রিলের মতো যন্ত্র। একটুখানি ছিদ্র করে তার নরম অংশ সে শুষে বের করে। ঝিনুকখেকো কিছু পাখি আছে যারা শক্ত ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে খোলস ভাঙতে পারে। দেখছ তো ঝিনুকের শত্রুরা কতরকম কলাকৌশল করে তার বিরুদ্ধে? যদিও খাদ্যের জন্যই অধিকাংশ ঝিনুক ব্যবহৃত হয়, তবুও ঝিনুকের সবচেয়ে বড় মূল্য কিন্তু তার মুক্তার জন্য। শুধু বিশেষ ধরনের ঝিনুকই মুক্তা দিতে পারে। কখনো ছোট একটু বালির কণা বা অন্য কিছু খোলসের মধ্যে ঢুকে ওখানে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। তখন ঝিনুক তার শরীরের রস দিয়ে ঐ জিনিসটি ঢেকে দেয়। স্তরে স্তরে রস জমতে জমতে এখানে মুক্তার সৃষ্টি হয়। মুক্তা তাই ঝিনুকের যন্ত্রণার সৃষ্টি। শুধু ঐ বিশেষ ধরনের ঝিনুকের মুক্তাই অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হবার মতো সুন্দর হয়। উষ্ণ অঞ্চলের পানিতেই এই মুক্তা-ঝিনুক পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কোনো কোনো নদীর পানিতে গোলাপি রঙের মুক্তা হয় এমন ঝিনুক পাওয়া যায়।

মুক্তা-ঝিনুক যে-খোলসের মধ্যে হয় সেই খোলসটির গাটিও খুব সুন্দর থাকে। সেটিও অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া এমনিতেও ঝিনুকের খোলস নানা জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়—বোতাম, পুতুল ইত্যাদি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে আগের দিনে চামচ বা পাত্র হিসাবেও এর ব্যবহার ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর ঝিনুক ধরা হয়—এগুলো নানা ব্যবহার্য–জিনিস তৈরিতে কাজে লাগে।

শুঁয়োপোকা-কাহিনী

শুঁয়োপোকা, বিচ্ছু, ছ্যাঙ্গা—গা-রিরি-করা ভয়ে দূর-দূর করার জিনিস অনেকের কাছে। আবার রেশমের চাষ করছেন যে-বোনটি তিনি সযত্নে তাঁর ডালায় শুঁয়োপোকার যত্ন নিচ্ছেন, পাতা খাওয়াচ্ছেন, বড় করে তুলছেন। এরা সবাই শূককীট-পতঙ্গের জীবনচক্রের একটি ধাপ। যে-প্রজাপতির সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ, তারও শুরু এই শূককীট হিসাবেই। পতঙ্গের যেমন বিচিত্র বাহার, শুঁয়োপোকাদেরও তেমনি। আকার, আকৃতি, রং, লোম, চেহারা—এসবের বহু বৈচিত্র্য। লাখখানেক আলাদা রকমের শুঁয়োপোকার বর্ণনা বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন।

ডিম থেকে শূককীটের শুরু আর গায়ের চারিদিকে পুত্তলি বানিয়ে তার মূককীটে রূপান্তর—এর মধ্যে শূককীট অতি দ্রুত প্রচুর বড় হতে পারে। এর মধ্যে তার ২০০০ থেকে ৩০০০ গুণ বড় হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। মানবশিশু যদি ঐ হারে বাড়ত তা হলে ১০ বছর বয়সে তার ওজন হত ৮৬ টন। ঐ বাড়ার সময় শূককীট অন্তত ৪/৫ বার খোলস বদলায়।

ওভাবে বড় হতে গিয়ে শুঁয়োপোকার নিত্য কাজ আহার করা। ঐ আহারের স্টাইলও তার আকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। শুঁয়োপোকারা নিরামিশাষী একথা আমরা জানি—প্রচুর পাতা বা কচি কাণ্ড ভোগে লাগিয়েই এরা দ্রুত মোটাতাজা হয়। বাঁধাকপির পরতে পরতে পাতার অন্তরালে নিশ্চিন্তে বসে খেতে যেমন কোনো শুঁয়ো অভ্যস্ত, অন্যরা আবার পাতার বা কাণ্ডের উপর খোলামেলা বসে আহারপর্ব চালিয়ে যায়। অনেকে আবার আড়ালে থেকে ভোজনের জন্য নিজেরাই বিশেষ ব্যবস্থা করে নেয়। কেউ পাতা মুড়িয়ে নিয়ে বা পাতা বেঁধে নিয়ে আড়াল তৈরি করে, আবার কেউ কাণ্ডের ভেতর ছিদ্র করে ওর মধ্যে আশ্রয়

নেয়। কেউ-কেউ আবার পাতার দুই তলের মাঝখানে কোষকলার মধ্যেই ঢুকে পড়তে পারে। সাধারণত শুরুতে এভাবে আড়ালে অন্তরালে থেকে আহার করলেও আকারে বড় হবার পর শুঁয়োপোকা বাইরে বেরিয়ে খোলামেলা ও-কর্ম চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শুরুতে অন্তরালে থাকার কারণ রয়েছে বইকী ! ও-সময় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা খুব প্রয়োজন। বাইরের চরম উত্তাপ বা আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পেতেও এটি সহায়ক। পাতা বা কাণ্ডের ভেতরে থেকে খাওয়ার সময় বেছে বেছে পছন্দসই অংশ খাওয়ার সুযোগ আছে। আকার যতদিন অতিরিক্ত বড় না হয়ে পড়ছে ততদিন ঐ সুযোগ নেওয়াটাই ভালো। পাতার বা কাণ্ডের অভ্যন্তরের শাঁসে নরম কোষকলা খেতে ভালো, পুষ্টিকরও বেশি। চামড়ার শক্ত কম পুষ্টিকর অংশ বাদ দেওয়া যায়।

আহার যেহেতু প্রধান কাজ, শূককীটের মুখ ও চোয়ালের আকার-আকৃতি এবং এদের বৃদ্ধিকে তার আহারপদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। অনেক শুঁয়োপোকার প্রত্যেকবার খোলস বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা, আকৃতি, প্রকৃতির প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। কোনোটির শরীর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাও আনুপাতিক হারে বড় হয়, আবার কোনোটির মাথা বড় হয় অনেক কম, যেমন শুরুতে মাথা শরীরের সিকি অংশ থাকলেও পরে গিয়ে এটি হয় শরীরের এক-শতাংশেরও কম। এই শেষের ক্ষেত্রে বড় শরীরের খাদ্য ছোট চোয়ালের মাধ্যমে যোগাতে খাদ্যাভ্যাসও পরিবর্তিত হয় অনেকখানি।

আকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুঁয়োপোকার একটি সুবিধা হয়, তা হল শরীরের উত্তাপ বাড়াতে পারা। বড় আকারের শুঁয়োপোকা বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে ১০° পর্যন্ত বেশি উত্তাপ শরীরের ভেতর সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য দিনের বিভিন্ন সময় সূর্য যেদিকে যায় শুঁয়োপোকা সেদিকে তার গা মেলে দেবার চেষ্টা করে। অনেক শুঁয়োপোকার জন্য উত্তাপ বাড়িয়ে নিজের বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করা দরকার কারণ শীতের দেশে শীত নামার আগেই মূককীট অবস্থায় চলে যাওয়া প্রয়োজন। ছোট শরীরের পক্ষে উত্তাপ সংরক্ষণ কঠিন হয়।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে শুঁয়োপোকাকে বিভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষা-কৌশল বদলাতে হয়। খুব ছোট অবস্থায় পাখির খাদ্য হিসাবে লোভনীয় না হলেও বড় হলে এটি সহজেই পাখির নজর কাড়ে। তাই অনেক শুঁয়োপোকা সারা গায়ে অসংখ্য শক্ত লোমে আবৃত হয় ছুঁতে আসলেই যা গায়ে বিদ্ধ হবে। আরো নানা বিচিত্র প্রতিরক্ষা-কৌশল নানা শুঁয়োপোকা নিয়ে থাকে। কতগুলো পাইন গাছের ছুঁচালো পাতা খেয়ে বাঁচে। ওরা ছোট থাকতে পাইন পাতার থেকে সহজে আলাদা করা যায় না। বড় ও মোটা হয়ে পড়ার পর অবশ্য কৌশল বদলাতে হয়। গায়ের সবুজের উপর তখন এমন সাদা ডোরা পড়ে যাতে অবশিষ্ট সবুজ অংশ পাইনের ছুঁচের আকার ধারণ করে এবং দূর থেকে পাইন পাতার মধ্যে তাকে আলাদা করা যায় না।

কোনো কোনো মথ প্রজাপতির শূককীট যখন একেবারে ছোট থাকে তখন তা দেখতে অনেকটা পাখির বিষ্ঠার মতো হয়—আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। বড় হলে ঐ ছদ্মবেশ আর কাজে আসে না। এর পর খোলস বদলাবার সময় তাই এটি সবুজ রং ধারণ করে। একেবারে শেষ পর্যায়ে যখন তার যথেষ্ট বড় আকার তখন তার ছোটখাটো একটি সাপের আকৃতি দেখা দেয়। একই সঙ্গে ঝাঁঝালো কটু কেমিক্যালস রসের একটি অস্ত্রও এর দেখা দেয়—কেউ বিরক্ত করলে যা পোকা নিঃসৃত করে। আসলে পত্রভুক নরম শরীরের এই অসহায় পোকাকে বাঁচার তাগিদে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয় বইকী—ছদ্মবেশ, গাভর্তি কাঁটার মতো লোম, ঝাঁঝালো কেমিক্যালস ইত্যাদি কত কী! শুঁয়োপোকাকে বুঝতে হলে, এর পুরো কাহিনী জানতে হলে প্রকৃতিতে একে নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। একদিকে নানা শত্রুর উপদ্রব, আবহাওয়ার বিরূপতা, ক্রমাগতভাবে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা এগুলোই তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা তাই এগুলো লক্ষ করছেন গভীর মনোযোগ-সহকারে।

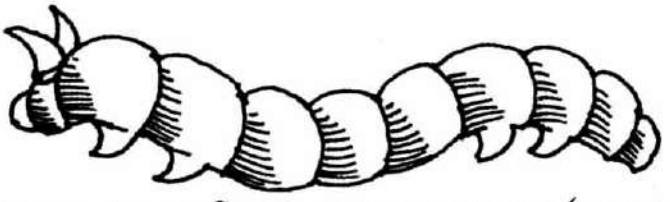

হলুদ শিংওয়ালা মথ নামে একটি পতঙ্গের ক্ষেত্রে এরকম পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, এরা বসন্তের শুরুতে বার্চগাছে যখন প্রথম পত্রমুকুল উন্মীলিত হয় ঠিক তখুনি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে নূতন বেরিয়ে-আসা শূককীট সদ্যখোলা মুকুলের ভেতরের পরতগুলোর ফাঁকে লুকিয়ে যায়। কয়েক দিন পর এদের প্রত্যেকে পাতার কিনারা বাঁকিয়ে মধ্যশিরার কাছাকাছি একে দেহনিঃসৃত রসের সুতা দিয়ে আটকে একটি ঠোঙার মতো তৈরি করে। ঠোঙা থেকে বের হয়ে আহার্যের সন্ধানে শূককীট এদিক-ওদিক যায় বটে কিন্তু প্রত্যেক বারই যার যার ঠোঙায় ফিরে আসে। তিন মাসের শূককীট পোকা জীবনে চার থেকে সাত বার ঠোঙা বদলিয়ে নূতন ঠোঙা তৈরি করে। এভাবে ঠোঙা বদলাবার একটি কারণ হল ইতিমধ্যে তার আকার এত বড় হয়ে পড়ে যে, আগের ঠোঙায় তার স্থান-সঙ্কুলান হয় না। আর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে আশপাশের খাদ্যমানে অবনতি। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, শুঁয়োপোকা খাওয়ার পর উদ্ভিদের ঐ অংশের একটি প্রাকৃতিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে শুঁয়োপোকার জন্য অপ্রীতিকর অথবা হজম গোলযোগকারী কিছু রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, নূতন নূতন পাতা পাওয়া যায় এমন জায়গায় শুঁয়োপোকার নিরাপদ বৃদ্ধি সহজতর হয়। তেমনি একসঙ্গে অনেকে মিলে থাকলেও তাদের সুবিধা হয়।

অবশ্য উভয় সুবিধা তারা নিতে পারে যদি পারিপার্শ্বিক উত্তাপ যথেষ্ট হয়। শীতকালে ২০° সেঃ উত্তাপের নিচে যত টাটকা পাতাই থাকুক আর যত বেশিসংখ্যক পোকা একসঙ্গে থাকুক তাতে তাদের সাধারণ বৃদ্ধির কোনো হেরফের হয় না। সূর্যে গা মেলে দিয়ে শুঁয়োপোকার উত্তাপ যখন ৩০° সেঃ পর্যন্ত উঠে যায় তখন ভালো পাতা পাওয়ার এবং দলবদ্ধ থাকার সুযোগ যাদের আছে তারা বাড়ে তাড়াতাড়ি—তাদের শূককীটের ভবিষ্যৎও এতে নিশ্চিত হয়।

শুঁয়োপোকার প্রতি কেন জানি আমাদের একটি সহজাত বিতৃষ্ণা আছে। সব ক্ষেত্রে এটি নায্য নয়। ধানের মাজরা পোকার কীড়া যখন ধানগাছের কাণ্ডের ভেতরে বসে কৃষকের সর্বনাশ ঘটায় তখন তার প্রতি রাগটা বোধগম্য। কিন্তু সাধারণভাবে সব শূককীট ক্ষতিকর নয়, এমনকি সব শূককীট দেখতে খারাপ এমন কথাও বলা যাবে না। প্রকৃতির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ মাখামাখি তারা ঢালাওভাবে সব শূককীট অপছন্দ করতে পারেন না। আর গল্পের কথায় যদি আসি, সারা দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ যারা এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়েছে তারা হুঁকায় টান দিতে দিতে যে-শুঁয়োপোকা এলিসের সঙ্গে আলাপ করছিল তাকে চেনে। প্রশ্ন হল, বাইরে বাগানে পাতার ফাঁকে আসল শুঁয়োপোকাকে আমরা কতখানি চিনতে পেরেছি।

সোনামণিদের খাবার

অনেকে একে বলে বেবিফুড। ছোট্ট সোনামণিদের কী খাওয়াবে এ নিয়ে সবার ভাবনা-চিন্তার সীমা নেই। মায়ের দুধ না খাইয়ে খুব ছোটবেলায় টিনের দুধ ইত্যাদি অনেকে খাওয়ায়, এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা তাদের আচ্ছা করে বকা দিয়ে দিচ্ছেন। আবার অনেকে বাচ্চার বয়স বেশ খানিকটা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দুধ ছাড়া অন্য কিছু দিচ্ছেন না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এও ভালো নয় মোটেই। সোনামণিদের আরো অন্যান্য খাবার দেয়া চাই, ঠিকমতো তৈরি করে।

আমরা এখানে কিন্তু শুধু মানুষের সোনামণিদের কথা বলব না। তোমরা তো জান—পশু-পাখি সবারই ছোট্ট সোনামণিরা রয়েছে, আর ওরাও আদর কম পায় না মা-বাবার। এই আমাদের আশেপাশের চড়ুইগুলোর কথাই ধরো। নিজেরা ওরা খায় শস্যদানা খুঁটে খুঁটে; কোথাও কেউ ধান শুকাতে দিলে তো কথাই নেই। কিন্তু বাচ্চাদের জন্য ধরে এনে এনে খাওয়ায় ছোট্ট নরম পোকা, কেঁচো—এসব। পশুপাখির ছোট্ট বাচ্চারাও সব খাবার হজম করতে পারে না। তাই মা-বাবার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। নেকড়ে বাঘরা তো তাদের বাচ্চার জন্য খাবার নিজেরাই অনেকখানি হজম করে এনে দেয়। নিজেরা ওরা খাবারটা গিলেই ফেলে। পেটের মধ্যে মোটামুটি নরম আর হজম হবার অবস্থায় এলে এটা বমি করে উগরে নিয়ে বাচ্চাকে তা-ই খাওয়ায়।

নেকড়ের পদ্ধতিতে অবশ্য সবার কাজ সারে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাদের খাবারে এমন জিনিস থাকা চাই যা বড়রা খায় না। বাচ্চাদের খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে হবে কিনা তাই। আর তাদের পেটে সহজে হজম হবার ব্যাপারটা তো আছেই। এদের খেতেও হয় খুব ঘনঘন। যুতমতো খাবারের মজুদ সবসময় না থাকলে বিপদ। নানা প্রাণী নানাভাবে এর সমাধান করল বটে, কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিল স্তন্যপায়ী জীবরা। বুঝতে পারছ কাদের কথা বলছি? স্তন্যপায়ী মানে মায়ের দুধ খেয়ে যারা বড় হয়— গরু ছাগল প্রভৃতি আমাদের পরিচিত পশুরা তো রয়েছেই, আমরা নিজেরাও আছি এই দলে।

এই সমাধানটা কিন্তু হল বড় চমৎকার। মায়ের কাছে সবসময়ের জন্য মজুদ রইল সোনামণির জন্য খাবার। খিদে পেলে, ইচ্ছে করলেই সে খেতে পারে। আর খাবারটাও যেই-সেই খাবার নয়—একেবারে ঠিক তার যা দরকার তা-ই। এই ব্যবস্থায় শিশুর খাবারের নিশ্চয়তা বড়দের চেয়েও ভালো হল। আবহাওয়া খুব খারাপ হল, বড়রা খাবার সংগ্রহে যেতে পারছে না, অভুক্ত থাকতে হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে বাচ্চা না খেয়ে থাকবে না—মায়ের দুধ সে ঠিকই পাবে। এমনকি মাকে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হলেও—যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে এক ফোঁটা চর্বি আছে বুকের দুধ তৈরি বন্ধ হবে না। আসলে কিছু-কিছু প্রাণী আছে যাদের মায়েরা যদ্দিন বাচ্চাকে দুধ দেয় তদ্দিন কিছুই মুখে দেয় না। নিজেদের বাচ্চাদের জীবনকে নিরাপদ করার এই চমৎকার ব্যবস্থার ফলে স্তন্যপায়ীদের উন্নতি অন্যান্যদের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

প্রাণীদের মধ্যে বুকের দুধ প্রথম এল কীভাবে? খুব সম্ভব ঘামের গ্রন্থিই পরিবর্তিত হয়ে দুধের গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিকে সুনির্দিষ্ট স্তন ছিল না কোনো প্রাণীর—একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে চামড়া থেকে বাচ্চা দুধ পেত। পরে আরো উন্নত প্রাণীতে অনেকগুলো গ্রন্থি থেকে আসা দুধ কয়েকটা মাত্র দুধের বাঁটে একত্র হয়ে এল। বেশির ভাগ প্রাণীতে বাচ্চা নিজেই দুধ চুষে টেনে নেয় বটে, কিন্তু ক্যাঙ্গারুর মতো

দু'একটা প্রাণী আছে যাদের বাচ্চার জন্মের পর অতটুকু শক্তিও থাকে না। সেখানে মা নিজেই বিশেষ ব্যবস্থায় মাংসপেশি সংকুচিত করে বাচ্চার মুখে দুধ জোরে ঢুকিয়ে দেয়। পানির নিচে যেসব মা বাচ্চাকে দুধ দেয় তাদেরও এটা করতে হয়। সেখানে তিমি বা ডলফিনের বাচ্চা বেশ সবল হলেও পানির ভেতর দুধ চুষে খাওয়া তাদের পক্ষে সহজ নয়—তাই মাকে সাহায্য করতে হয়। ভালো কথা, তোমরা হয়তো জান যে, তিমি বা ডলফিন পানিতে থাকলেও এরা মাছ নয়, স্তন্যপায়ী।

সব প্রাণীর দুধেই অনেকগুলো জিনিস থাকে—আমিষ ; চর্বি ; ল্যাকটোজ নামক শর্করা; ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়ামসহ বহু দরকারি খনিজ, ভিটামিন আর হরমোন। এককথায় দ্রুত বেড়ে উঠছে এমন বাচ্চার প্রয়োজনীয় সব জিনিসই দুধে রয়েছে। অবশ্য এসব জিনিস এক-এক প্রাণীর দুধে এক-এক অনুপাতে থাকে। দুধের ভেতর বাড়ার উপাদান খানিকটা এর চর্বির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি—শতকরা প্রায় তেপ্পান্ন ভাগ। এই কারণেই এই দুধ খেয়ে বাচ্চা তিমি দিনে দেড় মণেরও বেশি হারে ওজন বাড়াতে পারে। খরগোশের দুধেও শতকরা চব্বিশ ভাগের মতো চর্বি থাকে। সেই তুলনায় মাত্র শতকরা তিন থেকে ছয় ভাগ চর্বিযুক্ত মানুষের দুধকে প্রায় চর্বিহীন বলা যায়। তবে শর্করার (চিনি) পরিমাণ কিন্তু মানুষের দুধে তুলনামূলকভাবে খুব বেশি। আর যাই হোক আমাদের সোনমণিরা মিষ্টি দুধ খেতে পারে।

সোনামণিরা যেন সবসময় বিশুদ্ধ ভালো খাবার পেয়ে বড় হতে পারে সেটাই স্তন্যপায়ীদের সুবিধা এটা আমরা আগেই দেখেছি। তবে স্তন্যপায়ী ছাড়া এরকম তৈরি-খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা আর কারো নেই একথা বলা যাবে না। শ্রমিক-মৌমাছিদের এরকম গ্রন্থি থাকে যার 'দুধ' খাইয়ে এরা বাচ্চাদের বড় করে। এই দুধ খেয়েই রানি-মৌমাছি দৈনিক দুই হাজার ডিম পাড়তে পারে। বুঝতেই পারছ এই দুধের পুষ্টি কত। পিঁপড়া আর উইরা তাদের বাচ্চা শুঁয়োপোকাকে মুখের একধরনের লালা খাইয়ে বড় করে। এই লালায় দুধের মতো পুষ্টিকর নানা উপাদান থাকে।

এমনকি মাছদেরও কারো কারো বাচ্চাদের খাবার নিজের শরীর থেকে তৈরি অবস্থায় দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাজন নদীতে একরকম মাছ রয়েছে যারা শরীরের হলুদ এক-রকম রস খাইয়ে বাচ্চা বড় করে। জন্মাবার পর থেকে এরা মায়ের গায়ে লেগে থেকে এই রস চেটেপুটে খায়। ঝাঁক বেঁধে মায়ের পিঠে ও পাশে চেপে বসে এবং তার সাথেই চলতে থাকে। তবে একবার খাওয়ার পর আবার যখন খিদে পায় মা তখন নিজে আর দুধ দেয় না, বাবাকে ডাক দেয়। মা নিজের গা থেকে বাচ্চাগুলো ঝেড়ে ফেললে সেগুলো এবার বাবার গায়ে গিয়ে ওঠে এবং সেখান থেকেই সেই হলুদ রস খেতে আরম্ভ করে। এভাবে পালাক্রমে মা আর বাবা অনেকদিন বাচ্চাদের খাওয়ায়। স্তন্যপায়ীদের চেয়ে তাদের বরং

সুবিধা একটু বেশিই—বাবা-মা দু'জনেই দুধ দিচ্ছে। ওসিলোটস্কেট নামে একটা মাছ আছে যার কানকোর কাছে দুধের কিছু গ্রন্থি থাকে। বাচ্চারা ক্যাঙ্গারুর মতো মায়ের পেটে একটা থলির মধ্যে থাকে আর এই 'দুধ' গড়িয়ে তাদের কাছে যায়।

পাখির বাবা-মা এক হিসেবে খুব ভালো, বাচ্চাদের বড় কষ্ট করে ওরা খাওয়ায়। বেচারাদের নিজের দুধ না থাকায় খাওয়ানোটা সহজ হয় না। তবে কবুতর জাতীয় কিছু পাখিরও একরকম দুধ আছে বইকী ! ওরা অন্য খাবারকে এই 'দুধে' ভিজিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ায়।

দেখলে তো সোনামণিদের খাওয়ার জন্য প্রাণিজগতে কত বিচিত্র ব্যবস্থা রয়েছে। সোনামণিরা সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বড় হলে তবেই-না দুনিয়াতে সেই প্রাণীরা ভালোভাবে বেঁচে থাকবে।

পাখি কেন গান গায়

'বউ কথা কও, বউ কথা কও'। পাখির গানে কথা তুলে দিয়েছে কাব্যপ্রেমিক মানুষ। হয়তো গানের একটা কারণও প্রচ্ছন্ন রয়েছে একথার মধ্যে। কিন্তু এসব কবির কল্পনা। বিজ্ঞানীরা অত সহজে সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি ; কিন্তু তাঁরাও ভেবেছেন। বরং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই ভাবছেন। ডারইউন তাঁর 'ডিসেন্ট অব ম্যান' বইতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এটা। পাখির গানের প্রতি বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আজও অব্যাহত রয়েছে।

জীববিদরা পাখির গানের ধ্বনিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেন। বছরের যে-কোনো সময়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পাখি যে সরল ধ্বনির ডাক দেয় সেটি, আর প্রজনন ঋতুতে পুরুষ-পাখির জটিলতর গান। প্রথমটি নিয়ে বেশি সমস্যা নেই। এটা অন্য জীবজন্তুর মতোই নিজের পরিচয়, প্রকৃতি এবং অবস্থান ঘোষণার একটি সহজাত উপায়মাত্র। ভাবনাটা দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জটিল ধ্বনি ও সুরসমৃদ্ধ পাখির গান নিয়ে। সরল ডাক যেটুকু করতে পারে শুধু সেটুকুর জন্যই এত জটিল গানের সৃষ্টি নিশ্চয়ই হয়নি। নেহাত সঙ্গীত উপভোগের জন্য বা মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যও যে এটা হয়নি তাও প্রায়-নিশ্চিত।

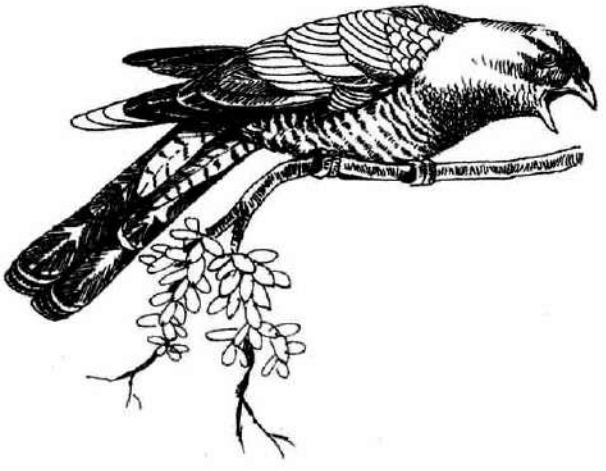

এ সম্বন্ধে আলাদা দুটো মত রয়েছে। একদল মনে করেন যে, শ্রুতিমধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রজনন-সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করার জন্যই এই গান। সঙ্গীত ছাড়া এর মধ্যে অর্থবোধক তথ্য বড় একটা নেই। অবশ্য এরকম সঙ্গীত সৃষ্টি করতে গিয়ে পাখির বিপদও আছে। শত্রুর দল এই গান শুনে বড় সহজে তাদের শিকারকে খুঁজে পেতে পারে। তা ছাড়া এভাবে একটানা গান গেয়ে যাওয়া সময় ও শক্তির দিক থেকে ব্যয়বহুল। বিবর্তনবাদীরা তাই নিঃসন্দেহ নন যে, জোড় বাঁধার এরকম বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল একটা ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সপক্ষে যায়।

দ্বিতীয় দল মনে করেন যে, পাখির গানের মধ্যে অনেক কথা রয়েছে, অনেক খবর রয়েছে। আমরা এখনো খবরগুলো উদ্ধার করতে পারছি না বলেই এটা বুঝতে পারছি না। অবশ্য বহুদিন ধরে অনেক আধুনিক এবং উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেও পাখির গানের মধ্যে এমন কোনো সমৃদ্ধ তথ্যবহুল কিছু আবিষ্কার করা যায়নি যা একে অন্যান্য জীবজন্তুর ডাকের চেয়ে মানুষের ভাষার বেশি কাছাকাছি কিছু বলে প্রতিপন্ন করতে পারে।

মোটের উপর জীববিজ্ঞানীদের প্রবণতা হল পাখির গানের সাথে তার নিজ এলাকার উপর প্রভুত্ব ঘোষণাকে সম্পর্কিত করার। সঙ্গিনী আকর্ষণের কাজের চেয়ে এটি আরো বেশি সোচ্চার প্রয়োজন। সচরাচর পাখির গানের এই প্রভাবটিই আমাদের চোখে পড়ে বেশি। বিশেষ করে প্রজনন ঋতুতে পাখিরা নিজ এলাকা নিয়ে অত্যন্ত কলহপ্রিয় এবং গানের মাধ্যমে অন্য পুরুষ-পাখিকে আগেভাগেই জানিয়ে দিতে চায় যে এইখানে 'নো ভেকেন্সি'। কিন্তু আরো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা শুধু এই নয়।

অনেকগুলো পাখির ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সঙ্গিনী জুটে যাওয়ার পর পুরুষ-পাখির গানের পরিমাণ অনেক কমে যায়। তবে ঐ সময়ও যদি অন্য কোনো পুরুষের ডাক শোনা যায়, তা হলে কোনো কোনো পাখি এ অবস্থায়ও গান গেয়ে তার অধিকার ঘোষণা করে। টেপ-রেকর্ড-করা পাখির গান মাইকে বাজিয়ে এরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। অন্য পাখিরা অবশ্য জোড় বাঁধার পর শত্রু পুরুষের আগমনকে নর্তন-কুর্দন বা মারামারির মাধ্যমে বাধা দেয়, গান দিয়ে নয়। এর থেকে অনেকে মনে করেন যে, উভয় ক্ষেত্রে সঙ্গিনী-আকর্ষণটাই গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেউ-কেউ এলাকা প্রতিরক্ষার কাজে গানের একটি বাড়তি ব্যবহার করে মাত্র।

পুরুষ-পাখির গানের সমৃদ্ধ সঙ্গীতের সৃষ্টিতে যে স্ত্রী-পাখির পছন্দভিত্তিক নির্বাচন-প্রক্রিয়া কাজ করে এসেছে সেটা স্বয়ং ডারইউনই তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো পাখির গানে পাঁচ সেকেন্ড স্থায়ী কলিতে কয়েকটা সিলেবল যেমন থাকতে পারে, তেমনি কোনো-কোনোটায় মিনিটের উপর স্থায়ী কলিতে পঞ্চাশের বেশি সিলেবলের অসংখ্য রকমের সমন্বয়ের কাজ থাকতে

পারে। এরকম জটিল সঙ্গীতের একমাত্র প্রাকৃতিক উপমা হতে পারে পুরুষ-ময়ূরের পুচ্ছের বর্ণচ্ছটা আর প্যাটার্নের জটিল পারম্পর্য। বিবর্তনবাদীরা এই উভয়ের সৃষ্টি একই নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বলে মনে করেন। সেইসব পুরুষ-পাখিই সার্থক প্রজননের মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো টিকিয়ে রেখে যেতে পেরেছে যাদের পক্ষে তাদের সঙ্গিনীদের মন যুগিয়ে গানের তান তোলা সম্ভব হয়েছে। এটিই বিবর্তনের নির্বাচন।

উল্লিখিত অনুমানটি, অর্থাৎ পাখির গানের বর্ণাঢ্য ধ্বনি ময়ূরপুচ্ছেরই একটি শব্দ-সংস্করণ কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। কারণ অতীতের জন্য যা সত্য, এখনকার জন্যও তা সত্য হতে বাধ্য। দেখতে হবে স্ত্রী-পাখির পছন্দ কুশলী গায়কের সপক্ষে যায় কি না ; প্রেমের প্রতিযোগিতায় অধিকতর সুরসমৃদ্ধ জটিল গানের কদর বেশি কি না। এর নির্ণয়ের জন্য অবশ্য প্রথমে সুরের জটিলতা মাপার বস্তুনিষ্ঠ একটা পদ্ধতি প্রয়োজন। গানে সিলেবলের সংখ্যাকে এ কাজে ব্যবহার করা যায়। গানের রেকর্ড থেকে ধৈর্যসহকারে এই সিলেবল-এর সংখ্যা বের করা যায়। প্রজনন এলাকায় পাখির আগমনের পর থেকে কোন পাখির ক'দিন পর জোড় বাঁধা সম্ভব হল তা তার গানের জটিলতার বিপরীতে লেখচিত্রে সাজানো হল। এভাবে দেখা যায় যে পাখির গান যত সমৃদ্ধ, তার সঙ্গিনী জুটছে তত আগে। এখানে বলা দরকার যে, একই জাতের সব পাখির গান সাধারণভাবে শুনতে একই হলেও তাদের সুরের জটিলতায়, সিলেবল-এর সমাবেশে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যা উল্লিখিত বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। এরকম পরীক্ষায় কয়েক জাতের পাখির ক্ষেত্রে প্রজনন সাফল্যে সমৃদ্ধ সঙ্গীতের ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে।

একই 'গণের' (Genus) বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের মধ্যে তুলনা করে, পাখির গণের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে আরো কিছু জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের পার্থক্যটুকুও লক্ষ করা প্রয়োজন। পাখিরা সাধারণত একদারনিষ্ঠ, সন্তান প্রতিপালনে বাবা-মা উভয়ের প্রয়োজন হয় বলে উভয়ের স্থায়ী বন্ধন প্রাকৃতিক নির্বাচনের সপক্ষে কাজ করেছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাদ্যের সহজলভ্যতার ফলে সন্তান প্রতিপালনে মা নিজেই যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ফলে পুরুষ-পাখির আর এক স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকা বংশরক্ষায় প্রয়োজনীয় থাকেনি। এভাবে বিবর্তিত পুরুষ-পাখিগুলো বহুচারী। এরা একের পর এক বিভিন্ন স্ত্রী-পাখির সাথে জোড় বাঁধে, কিন্তু কোনোটার সাথেই বন্ধন স্থায়ী হয় না।

সঙ্গীতের প্রতি সঙ্গিনীদের আকর্ষণের ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তা হলে বহুচারী পুরুষ-পাখিদের ক্ষেত্রে গানের বর্ণাঢ্যতা বেশি হওয়ার কথা। কারণ একের পর এক সঙ্গিনী জোটাতে হলে তার গানকে মন-মাতানো হতে হবে। আর এরকম ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার তীব্রতাও অধিক। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা ঠিক উলটো। একই গণের ছয়

প্রজাতির চড়ুইয়ের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল যে, দুটি মাত্র প্রজাতির পুরুষরা বহুচারী, এদের গানটাও বড় সাদামাটা নিতান্ত স্বল্প ক'টা সিলেবল নিয়ে ; আর গানের কলির স্থায়িত্বও সবচেয়ে কম। তা হলে? ব্যাখ্যাটি মনে হয় এরকম : বহুচারী পাখির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পাখির বাছবিচার কম। কারণ একটিমাত্র পুরুষে তাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় না, কাজেই কোনো বিশেষ পুরুষ-পাখির গুণাগুণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়ে সে এগোবে না এমন কথা নেই। সে বরং দেখবে যে-পুরুষটির এলাকায় সে যাচ্ছে সেখানে খাবার সহজলভ্য কি না, যাতে সে একাই সন্তানকে খাওয়াতে পারে। পুরুষ-পাখি তাই তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ বাড়াবার কাজে বেশি শক্তি ব্যয় না করে, তার এলাকার আকর্ষণ বাড়াতেই তা ব্যয় করে। দেখা যায় যে বহুচারী পুরুষদের এলাকা বড় এবং সমৃদ্ধ হয় এবং সেখানে বেশ ক'টি স্ত্রীর জায়গা হতে পারে। এখানে পুরুষের গান বিবর্তিত হয় প্রধানত অন্য পুরুষের বিরুদ্ধে এলাকার সম্প্রসারণের জন্য ; সরাসরি সঙ্গিনী আকর্ষণের জন্য নয়। ছোট ছোট সরল ডাকেই হয়তো জায়গার খবরদারি করা যায় ভালো।

অন্যদিকে একদারনিষ্ঠ পাখিগুলোর এলাকা অপেক্ষাকৃত ছোট, খাবার তাদেরকে এলাকার বাইরে থেকেই সংগ্রহ করতে হয়, প্রয়োজন হয় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পরিশ্রম। সেক্ষেত্রে স্ত্রী-পাখিকে তার পুরুষটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে হয়। অনেক পাখির ক্ষেত্রে গানের কুশলতাই পুরুষের নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং বিবর্তনের অমোঘ পদ্ধতিতে এই কুশলতা যুগে যুগে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে বসন্তের পাখির অপূর্ব সঙ্গীতে রূপ পেয়েছে।

কীটপতঙ্গের অনুভূতি

দুই দল পিঁপড়ার সারি। একদল যাচ্ছে আর একদল আসছে। দেখা যাচ্ছে মুখোমুখি হতেই এরা পরস্পরের কাছাকাছি গিয়ে একের শুঁড় অন্যটার সাথে ঘষে নিচ্ছে। এটি কিন্তু পিঁপড়ার মধ্যে তথ্যবিনিময়ের একটি কায়দা— যে-ক্ষমতা আমাদের নেই। বহু কীটপতঙ্গের এরকম নানারকম অনুভূতির ক্ষমতা রয়েছে—স্পর্শ-অনুভবের। কিংবা আলো, তাপ, রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি, কম্পন ইত্যাদি অনুভবের। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এসব অনুভূতি কীটপতঙ্গরা তাদের স্নায়ুতন্ত্রীতে পৌঁছে দেয়।

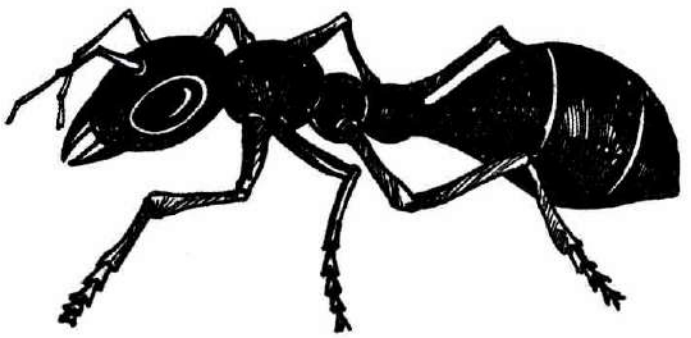

স্পর্শের বোধ জন্মাবার জন্য অনেক পতঙ্গের সারা গা অনুভূতিশীল একরকম লোমে ঢাকা থাকে। এরা বিশেষভাবে কার্যকর সামনের অ্যান্টেনা বা শুঁড়ে আর পায়ের নিচের অংশে। আসলে এরকম প্রত্যেকটি লোম পতঙ্গের খোলস এবং নিচের চামড়ারই একটি পরিবর্তিত রূপ। এর তলায় থাকে বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন জীবকোষ। স্পর্শ-অনুভূতিটি আমাদের জন্য যত না গুরুত্বপূর্ণ কীটপতঙ্গের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। ধরা যাক, আমাদেরকে চোখ বেঁধে কামরার অন্য প্রান্ত থেকে কোনো একটা জিনিস খুঁজে আনতে দেওয়া হল। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে স্পর্শ-অনুভূতির মাধ্যমে এটি যেভাবে আমরা করব, পতঙ্গ

সারাক্ষণই প্রায় তা-ই করে। সাধারণত এরা আলোক অনুভূতির উপর নির্ভর করে কম। প্রায়ই হরণ স্বরূপ চোখের এই গুণের জন্যই গঙ্গাফড়িং উড়তে উড়তে শিকার ধরতে পারে।

অধিকাংশ পতঙ্গ বিভিন্ন রঙের মধ্যে তফাত করতে পারে। বিশেষ রঙের পাত্রে চিনি রেখে দেখা গেছে যে, পরে চিনি না থাকলেও মৌমাছি সেই রঙের খালি পাত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে অন্য রঙের পাত্র ফেলে রেখে।

সব পতঙ্গের মধ্যে শোনার অনুভূতিটি সমান উন্নত নয়। বেশ কিছু পতঙ্গ বদ্ধ কালা। তবে অনেক পতঙ্গের শ্রবণক্ষমতা আবার মানুষের চেয়েও বেশি। পতঙ্গের শ্রবণেন্দ্রিয় দু'রকমের সংবেদী লোম আর পর্দা। সংবেদী লোম অনেকটা স্পর্শ-অনুভূতিসম্পন্ন লোমের মতোই কাজ করে। শব্দের কাঁপুনিটি এ লোমে ধরা পড়ে। শ্রবণের পর্দাগুলো সাধারণত স্নায়ুতন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত পাতলা পর্দার আকারে থাকে। এদের অবস্থিতিও নানা পতঙ্গের দেহের নানা অংশে। ঝিঁঝিপোকার এগুলো থাকে সামনের পায়ে। ঘাস-ফড়িঙের এগুলো থাকে পেটের সামনের অংশে। অনেক পতঙ্গের এ পর্দা থাকে বুকে। পতঙ্গ তার শ্রবণক্ষমতা সাধারণত ব্যবহার করে একই প্রজাতির অন্য পতঙ্গের অবস্থিতি উদ্ঘাটন করতে।

ছোট্টদেহী কীটপতঙ্গের মধ্যেও কিন্তু অনুভূতির বহুরকম ক্ষমতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে, যা অনেক সময় আমাদেরকেও হার মানায়। এবং পায়ের নিম্নাংশেও এরা প্রচুর রয়েছে। কাজেই বলা যায় পতঙ্গ পা দিয়েও স্বাদ নেয়।

তাপ ও আর্দ্রতা অনুভবের ক্ষমতা পতঙ্গের রয়েছে, তবে ঠিক কীভাবে এটি কার্যকর হয় তা এখনো জানা যায়নি। মশা মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরের উত্তাপ অনুভব করে তার শিকার খুঁজে পায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি এখনো অনাবিষ্কৃত।

সাধারণভাবে পতঙ্গের আলোক অনুভবক্ষমতা কম হলেও তার এই ক্ষমতার কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা লাল আর বেগুনির মধ্যে সব রং দেখি, কিন্তু অধিকাংশ পতঙ্গ লালের দিকটি তেমন না দেখলেও তাদের দৃষ্টি বেগুনি ছাড়িয়ে অতিবেগুনি পর্যন্ত প্রসারিত হয় যা কিনা আমাদের কাছে অদৃশ্য। মৌমাছির এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। এরা আলো কোন তলে পোলারায়িত রয়েছে সেটিও বুঝতে পারে। এই ক্ষমতাটিকে তারা দিঙ্‌নির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করে।

পতঙ্গের আলোক-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় তিন রকমের—সারা দেহ, সরল চোখ, যৌগিক চোখ। নিম্নশ্রেণীর অনেক কীটপতঙ্গ সারা দেহ দিয়েই দেখে—কোনো বিশেষ চোখ দিয়ে নয়। অনেক পতঙ্গের কিন্তু সরল ও যৌগিক উভয় রকমের চোখ থাকে। গোটা তিনেক সরল চোখ থাকলেও পতঙ্গের এ চোখকে ফোকাস করার ক্ষমতা নেই। মনে হয় এদের কাজ আলোর তীব্রতা মাপা আর দেখার জন্য যৌগিক চোখকে সতর্ক করা।

পতঙ্গের প্রধান দর্শনেন্দ্রিয় তার যৌগিক চোখ। দশ থেকে ত্রিশ হাজার ভিন্ন ভিন্ন একক লেন্সের সমন্বয়ে এরা গড়া। এসব লেন্স মৌচাকের মতো ষড়ভুজ খোপের আকারে পরস্পরের সাথে সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রত্যেকটি লেন্স থেকে আসা আলো আলোকবিন্দুর একটি মোজাইকের আভাস সৃষ্টি করে। এমনিভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আসা আলো দেখার সুবিধা হয় বটে কিন্তু সামগ্রিক ছবিটি খুব স্পষ্ট হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পতঙ্গ স্পষ্ট ছবি পেতে চায় না, বিভিন্ন আকৃতি এবং বিশেষ প্যাটার্ন আলাদা করতে পারলেই তাদের চলে। যৌগিক চোখে এ কাজটি ভালোই সম্পন্ন হয়। তা ছাড়া চলন্ত বস্তুকে দেখতে বা নিজে চলন্ত অবস্থায় থাকতে দেখতে যৌগিক চোখ বেশ উপযোগী। পতঙ্গের জন্য এটিই দরকার। ওদেরকে দেখা যায় সামনের শুঁড়গুলো নাড়াতে—স্পর্শের উপর নির্ভর করে চলতে হয় কিনা তাই।

পায়ের নিম্নাংশে যে স্পর্শ-অনুভূতির ব্যবস্থা রয়েছে তার সাথে পতঙ্গের ওড়ার একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যে পা মাটি থেকে আলগা হয় সেখানকার স্পর্শ-অনুভূতিতে ছেদ পড়ে এবং সেই সংকেতটি পাখার স্নায়ুকে সচল করে তোলে।

পতঙ্গেরও ঘ্রাণ নেবার আর স্বাদ নেবার অনুভূতি থাকতে পারে। এই বোধগুলো জন্মে রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি উদ্ঘাটনের ক্ষমতা থেকে। ঘ্রাণ আর স্বাদ নেবার ব্যাপার দুটো এত কাছাকাছি যে, এদের আলাদা করা মুশকিল হয়। তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, বাতাসে বাষ্প হিসেবে যে রাসায়নিক দ্রব্য থাকে তার উদ্ঘাটন ঘ্রাণের কাজ ; আর তরল বা কঠিন আকারের দ্রব্য বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এসে যে অনুভূতি দেয় সেটি স্বাদ। এসব উদ্ঘাটকের উপস্থিতি পতঙ্গের দেহের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, আমাদের মতো নাকে ও জিহ্বায় সীমাবদ্ধ থাকে না।

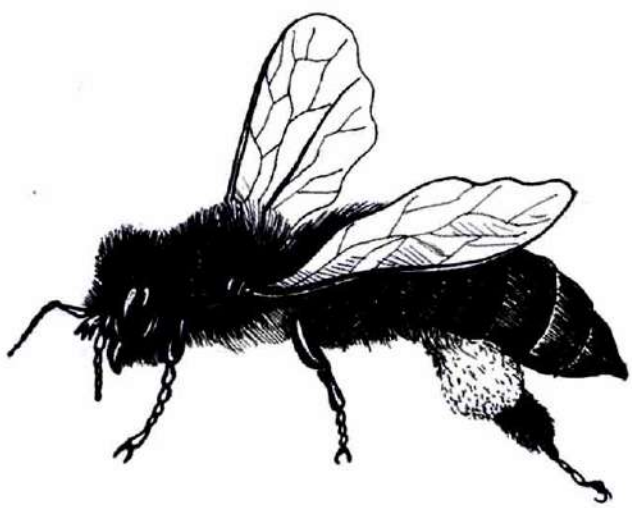

কীটপতঙ্গের জন্য ঘ্রাণ নেবার ক্ষমতার নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে নেবার জন্য, নিজের দলকে খুঁজে পাবার জন্য, ডিম পাড়ার অথবা খাদ্যসন্ধানের উপযুক্ত জায়গা খোঁজার জন্য—এমনি সব কাজে এরা ঘ্রাণ-অনুভূতিকে ব্যবহার করে। কোনো কোনো মথের প্রজাতি দুই মাইল দূর থেকে সঙ্গিনীর উপস্থিতি বুঝতে পারে তার ঘ্রাণশক্তি দিয়ে। কোনো পিঁপড়ার কলোনিতে যদি অন্য কলোনির পিঁপড়া এসে আক্রমণ করে তখন তার গায়ের ঘ্রাণ থেকেই আক্রমণকারী ধরা পড়ে এবং বিতাড়িত হয়। শুধু তা-ই নয়, পিঁপড়ার দল যাবার পথে যে গন্ধ রেখে যায় সেই গন্ধ শুঁকে অন্য পিঁপড়া তাদের অনুসরণ করতে পারে। ফুলের পরাগায়নের জন্য পতঙ্গের সহায়তা প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ফুল তার গন্ধ দিয়েই পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

পতঙ্গের যে শুধু স্বাদ অনুভবের ক্ষমতা রয়েছে তা-ই নয়, এ ব্যাপারে তার পছন্দ-অপছন্দও রয়েছে। যেমন মৌমাছি মিষ্টি স্বাদ পছন্দ করে। তবে কোনো কোনো ধরনের চিনি তার পছন্দ হলেও মানুষের তৈরি কৃত্রিম চিনি—যেমন স্যাকারিন তার মোটেই পছন্দ নয়। স্বাদের উদ্ঘাটকগুলো যদিও মুখেই বেশি থাকে—শুঁড়েও তা থাকে।

পশুপাখির আচরণ : যে বিজ্ঞান এখনো শৈশবে

হ্যাঁ, এটাও বিজ্ঞান। ঐ যে তুমি মনের সুখে পিঁপড়ার পিছনে লাগ কিংবা লক্ষ কর মা-পাখি কেমন করে বাচ্চা-পাখির বিরাট হাঁ'য়ের মধ্যে খাবার এনে দেয়—ঐ পর্যবেক্ষণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত এক বিজ্ঞান। আর এটা যে শুধু তোমার মতো সবার কৌতূহল মেটাচ্ছে তাই নয়, বেশ কাজেও আসে এই বিজ্ঞান। আমাদেরকে নানাভাবে পশুপাখিদের কাছাকাছি আসতে হয়। গ্রামে চাষবাস করলে, পুকুরে নদীতে মাছ ধরতে গেলে, কত প্রাণীর সাথেই তো কারবার করতে হয়। হাল-বলদ, পোষা ছাগল, মোরগ-মুরগি এসব তো সামাল দিতেই হয়, যেসব পাখি ধান খেয়ে যায় তাদের সন্ধানও রাখতে হয়। কী অবস্থায় মাছকে ফাঁকি দিয়ে ধরা যাবে সে খবরও কি কম জরুরি? শহরে থাকলে? রান্নাঘরের তেলাপোকার উপদ্রব যাবে কোথায়? তা ছাড়া পোষা বেড়াল কিংবা কুকুরের খবর?

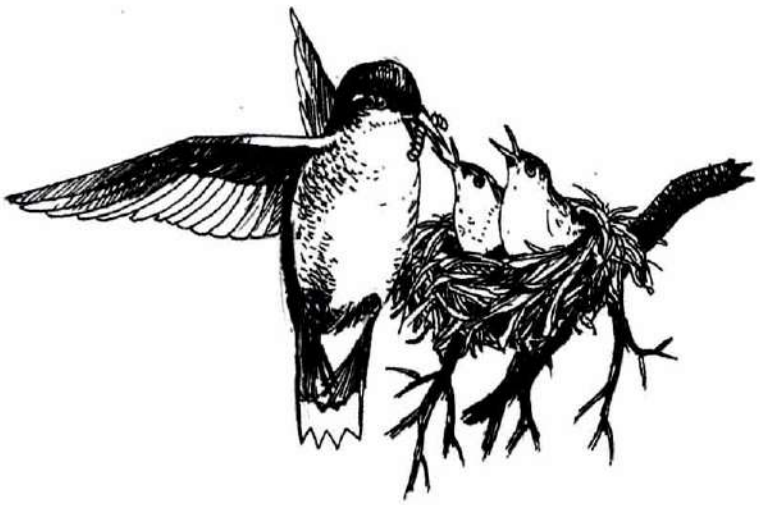

আচরণ মানে সবরকম আচরণ। হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতরানো, খাওয়া, জোড়বাঁধা, বাচ্চা দেয়া—এসব তো আছেই। তা ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য নড়াচড়া—যেমন শব্দ পেলে

কান খাড়া করা এও লক্ষণীয়। অনেক প্রাণী বিশেষ অবস্থায় চেহারা বদলায়, রং বদলায়—বদলাবার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে এটা শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য, আবার কোনো ক্ষেত্রে নিজের সাথির কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য। প্রত্যেকটি আচরণের পেছনে অনেক কিছু জানার আছে, বোঝার আছে। কুকুর কেন খায়? এটা বুঝতে গেলে জানতে হবে তার ক্ষুধার অনুভূতি কী, সে কি খাবার দেখে না তার গন্ধ শুঁকে প্রলুব্ধ হয়, সে কি ছোটবেলাতেই খাবার খুঁজে বের করার কায়দাকানুন শিখে নিয়েছিল? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠবে কুকুরের খাওয়ার আচরণকে বুঝতে হলে। শ'খানেক বছর আগে চার্লস ডারউইন 'বিবর্তনবাদ' আবিষ্কার করে সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, নিজেদের বাঁচার তাগিদে সব প্রাণী পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। সেসব প্রাণীই বেঁচে থেকে বংশ বৃদ্ধি করতে পেরেছে যাদের গুণাগুণ ও আচরণ খাপ খাওয়ানোর অনুকূলে ছিল। তখন থেকে বিজ্ঞানীরা চাইলেন পশুপাখির আচরণগুলোকে তাদের টিকে থাকার সাথে সম্পর্কিত করতে।

খাপ খাইয়ে নেবার জন্য বিশেষ আচরণ করার একটি উদাহরণ নেয়া যাক। একরকম মাছ আছে যাদের স্ত্রীজাতীয়রা বাসায় গিয়ে ডিম পাড়লে পুরুষ-মাছ সে-বাসা পাহারা দেয়। কিছুক্ষণ পরপরই পুরুষ-মাছ বাসাটা একবার ঘুরে আসে আর তারপর কিছুক্ষণ সজোরে পাখনা নাড়িয়ে বাসার দিকে পানি চালনা করতে থাকে। এটা সে কেন করে? সহজ কিছু পরীক্ষার মাধ্যমেই তা জানা গেছে। পুরুষ-মাছটাকে যদি সরিয়ে ফেলা হয় তা হলে ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যদি তাকে সেই আচরণ করতে দেয়া হয় কিন্তু ডিম আর তার মাঝখানে একটা কাচের দেয়াল দিয়ে দেয়া হয়, তা হলেও ডিম নষ্ট হয় ; কিন্তু যদি পুরুষ-মাছকে সরিয়ে ফেলে সেখানে একটা কাচের নল বসিয়ে এর ভেতর দিয়ে ক্রমাগত বুদবুদ-তোলা পানি বাসার দিকে দেয়া যায়—ডিম নষ্ট হয় না। বোঝা গেল ব্যাপারটা হচ্ছে ডিমকে বাতাস করা। বাসার পানি যাতে 'বদ্ধ' না হয়ে ক্রমাগত নূতন বাতাস পেতে পারে সেজন্যই পুরুষ মাছ সে-পানিকে চলাচলের অবস্থায় রাখে। নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচাবার জন্য এ আচরণ তার সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনের ফলে।

এভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীর জটিল সব আচরণের পেছনে টিকে থাকার জন্য খাপ খাইয়ে নেয়ার চমৎকার সব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। দেখা যায় যে প্রাণীর আচরণ তার জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে খুব দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে তা নয়। ডারউইনের আগে এই আচরণের সঠিক কোনো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই কেউ করেনি। তাঁর পর যে-ক'জন বিজ্ঞানীর নাম এক্ষেত্রে করতে হয় তাঁদের একজন হলেন হেনরি ফ্যাব্রে (১৮২৩–১৯১৫)। কীটপতঙ্গদের তাদের নিজস্ব পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ তিনিই

প্রথম করেন। ফ্রান্সে তাঁর নিজের বাগানে ৪০ বছর ধরে তিনি মৌমাছি ও বোলতাদের উপর এই পর্যবেক্ষণ চালান। এর ফলেই আমরা প্রথম জানতে পারি এদের আচরণ কত জটিল হতে পারে। এই বিষয়ের উপর পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের আর একজন হলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী ইভান পভলভ (১৮৪৯–১৯৩৬)। তাঁর 'কন্ডিশন্ড রিফলেক্স্' বা অভ্যস্তকৃত প্রতিক্রিয়া নামক তত্ত্ব দিতে গিয়ে তিনি এক বিখ্যাত পরীক্ষা করেছিলেন। একটা কুকুরকে প্রত্যেকবার খাওয়াবার ঠিক আগে একটা ঘণ্টা শোনালেই কুকুরের মুখে লালা আসত—সেটা অভ্যস্তকৃত প্রতিক্রিয়ার ফলেই।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে প্রাণীর আচরণের উপর কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন এমন কয়েকজনের উল্লেখ করা যায়। থিওডোর শ্নাইরলা কাজ করেন নিউইয়র্কে প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরে। তাঁর তৈরি নানারকম গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে চলতে দিয়ে তিনি পিঁপড়ার আচরণের উপর দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, পিঁপড়ার মতো ভালো শিক্ষার্থী পাওয়া দুষ্কর। একটা গোলকধাঁধায় গিয়েও তারা সেটা ঠিক মনে রাখতে পারে।

কার্ল ফন ফ্রিশ কাজ করেন অস্ট্রিয়ায় তাঁর নিজ বাড়িতে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মৌমাছির রং দেখার ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। মৌমাছিকে আকর্ষণের জন্য নানা রঙিন কার্ড ব্যবহার করে তিনি প্রমাণ করেন যে, মৌমাছিরা রংকানা নয়—আগে বিজ্ঞানীরা তা-ই মনে করতেন। ফুলে-ফুলে ঘোরার সময় মৌমাছি ফুলের রংও লক্ষ করে।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রেডারিক স্কিনার প্রাণীকে খাদ্যের জন্য নূতন ধরনের আচরণে অভ্যস্ত করার পরীক্ষণের জন্য বিখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ তিনি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে বিশেষ একটি বাক্সে পুরে শিখিয়েছেন যে, খাবার পেতে হলে তাকেও বিশেষ একটি বাতি জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর একটি নির্দিষ্ট হাতলে চাপ দিলে খাবারের দরজা খুলে যাবে।

অস্ট্রিয়ার কনরাড লোরেনৎস দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাণীর নিজস্ব 'ভাষা' শিখতে সমর্থ হয়েছেন। সেভাবেই তিনি সমর্থ হয়েছেন হাঁসের বাচ্চাদের সাথে এমন আচরণ করতে যাতে তারা জন্ম অবধি তাঁকেই তাদের 'মা' মনে করে ; তাঁর সাথে চলে, সাঁতার কাটে আর সন্তানের মতো অন্যান্য আচরণ করে।

প্রাণীর আচরণ প্রকাশিত হয় তার বিভিন্ন মাংসপেশির জটিল সব সংকোচন-প্রসারণের ক্রম হিসাবে। এরা নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশে। স্নায়ুতন্ত্র আবার তার অনুপ্রেরণা লাভ করে বিভিন্ন বাহ্যিক অবস্থা থেকে, আবার কিছুটা প্রাণীর নিজের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। খাবার দেখলে খাওয়ার আচরণ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ আচরণের জন্য পেটে ক্ষুধাও থাকা চাই।

অতীতে প্রাণীর আচরণ নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এদের সব আচরণকে মানুষের নিরিখে বিচার করতে চাওয়া হয়েছে বলে। মনে করা হয়েছে যে, মানুষের মতো এসব প্রাণীও রাগতে পারে, দুঃখিত হতে পারে, স্ফূর্তি পেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে দেখতে গেলে একটা পশু তেড়ে আসছে কারণ এটা 'রেগেছে' বা পালিয়ে যাচ্ছে কারণ এটা 'ভীত' এমন কথা সহজে বলা যায় না। তা ছাড়া একটা পশু আগে থেকে ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারে না—যা মানুষ পারে। অনেক প্রাণী অবশ্য এমন অনেক কিছু করে যা পরে গিয়ে কাজে একটা উপকার হয়। যেমন ওরা বাসা বোনে, বাচ্চাদের খাওয়ায়, দুর্দিনের জন্য খাবার সঞ্চয় করে যার সবই বহুদিন পরেও কাজ দেয়। কিন্তু এসব করার সময় ঐ বহুদিন পরের কথা চিন্তা করে তারা করে—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এসব মনে হয় না। আর একটা বড় কথা হল পশুপাখিরা তাদের আচরণে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার জন্য তৈরি থাকতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে-আচরণকে খুব দরকারি এবং সুচিন্তিত মনে হয়, অস্বাভাবিক অবস্থায় সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। একটা পাখির ছানা যদি দুর্ঘটনাক্রমে আহত হয়ে বাসার বাইরে চলে যায় বা খাবারের জন্য মুখ হাঁ না করতে পারে—তখন মা-পাখি ওই বাচ্চাকে না দেয় খাবার, না করে কোনো যত্ন—যেই মা-পাখিকে এতই সন্তানবৎসলা বলে মনে হয়। মনে হয় পাখির আচরণের মধ্যে শুধু সেই ছানাকে যত্ন নেবার অভ্যাসটুকু রয়েছে যে বাসায় আছে এবং খাবারের জন্য হাঁ করতে পারে। এর অন্যথায় কোনো অস্বাভাবিক অবস্থার সাথে সে তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে।

পশুপাখি কীটপতঙ্গের আচরণ-গবেষণা এখনো বলতে গেলে শৈশবে রয়ে গেছে। এখনো অনেক কাজ বাকি। আর কাজগুলো বেশ জরুরিও বটে। যাদের আমরা আপদ মনে করি সেসব অনিষ্টকারী প্রাণীদের আচরণ না বুঝতে পারলে তাদের আমরা ঠেকাব কী করে? আবার যারা আমাদের উপকারী প্রাণী তাদেরকেও ঠিকমতো পালন করতে গেলে এ-আচরণ বুঝতে হবে। তা ছাড়া আমাদের পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে গেলেও সমস্ত প্রাণীর সঠিক অবস্থান আমাদেরকে নির্ণয় করতেই হবে।

উইপোকা !
সাবধান !

আপনার বইয়ের শেলফের নিচে যদি হঠাৎ একদিন আপনি উইয়ের অবস্থান আবিষ্কার করেন, তা হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে? রীতিমতো আঁতকে ওঠার ব্যাপার নয় কি? এই ক্ষুদ্র জীব তাদের ক্রমাগত ও সম্মিলিত আক্রমণে আমাদের ঘরের নিভৃত কোণে নিঃশব্দে এমন ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে যে, একে ভয় না করে কেউ পারে না। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি কাজ করেন তা হলে এই উই থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। যদি এর আক্রমণের গোড়াতেই টের পাওয়া যায় তা হলে ভয়ের বেশি কিছু নেই। কারণ উইপোকার ধ্বংস-প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলে। ৬০ হাজার সদস্যবিশিষ্ট একটি সুপ্রতিষ্ঠিত উইরাজ্য তার পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালিয়েও দিনে মাত্র এক আউন্সের এক পঞ্চমাংশ কাঠ খেতে পারে!

উইপোকার সাথে নানা দিক দিয়ে পিঁপড়ার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তবে উভয়ের দেহগত বৈসাদৃশ্যও কম নয়। পিঁপড়ার মাথার সামনে যে স্পর্শক বা শুং রয়েছে তাতে কনুইয়ের মতো জোড়া আছে। উইয়ের শুং সোজা এবং পুঁতিদানার মতো আকৃতিতে গড়া। পিঁপড়ার বুক ও পেটের মাঝখানে সরু কোমর রয়েছে। কিন্তু উইপোকায় এই দু'টা প্রশস্তভাবে

লাগানো। পিঁপড়ার যখন পাখা থাকে তা একরকম হয় না, তাতে যে গুটিকয়েক শিরা থাকে তাদের প্যাটার্নও একরকম হয় না। কিন্তু উইপোকার পাখার আকার, আকৃতি ও প্যাটার্ন একই রকম হয় এবং তাতে অনেকগুলো ছোট শিরা থাকে।

আমাদের দেশে যে-উইপোকার উপদ্রব বেশি তা সাধারণত মাটির আশ্রয়ী। এদের সবসময় উষ্ণ বাতাস আর আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। নিজেদেরকে আর্দ্র রাখার জন্য এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে মাটি দিয়ে একরকম সরু নলাকার আচ্ছাদন তৈরি করে অগ্রসর হয়। উইয়ের বানানো এই নলগুলো আমরা দেয়ালে, মেঝেতে, সর্বত্র দেখতে পাই এবং এদের দেখেই উইয়ের অবস্থান সাধারণত টের পাই। উইয়ের যাত্রা সাধারণত তার স্বাভাবিক আবাস মাটি থেকে শুরু হয় ; আর যাত্রার গন্তব্য কাঠ বা কাঠের আসবাব জাতীয় কোনো খাদ্যবস্তু। যাত্রাপথে তাদের তৈরি করতে হয় ঐসব উই-পথ। অবশ্য কাঠ যদি সরাসরি মাটির সংস্পর্শে থাকে তা হলে তাদের কষ্ট করে এই উই-পথ তৈরি করতে হয় না। উইয়ের হাত থেকে বাঁচার নিশ্চিত উপায় হল আর্দ্রতার সাথে তার যোগাযোগ নষ্ট করে তাকে অসহ্য অবস্থায় ফেলে দেওয়া। এ যোগাযোগ মাটির সাথে সরাসরি সংস্পর্শে যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে তার তৈরি নলাকৃতি উই-পথগুলো। এগুলো ভেঙে দিতে হবে।

কাঠের খুঁটি। কাঠের খুঁটির কোনো অংশ যদি মাটিতে পোঁতা থাকে, তা হলে তা উইয়ের জন্য চমৎকার রাজপথের কাজ করতে পার। এরকম খুঁটির কাছাকাছি মাটিকে কীটনাশক দিয়ে উইমুক্ত করে নিতে হয়।

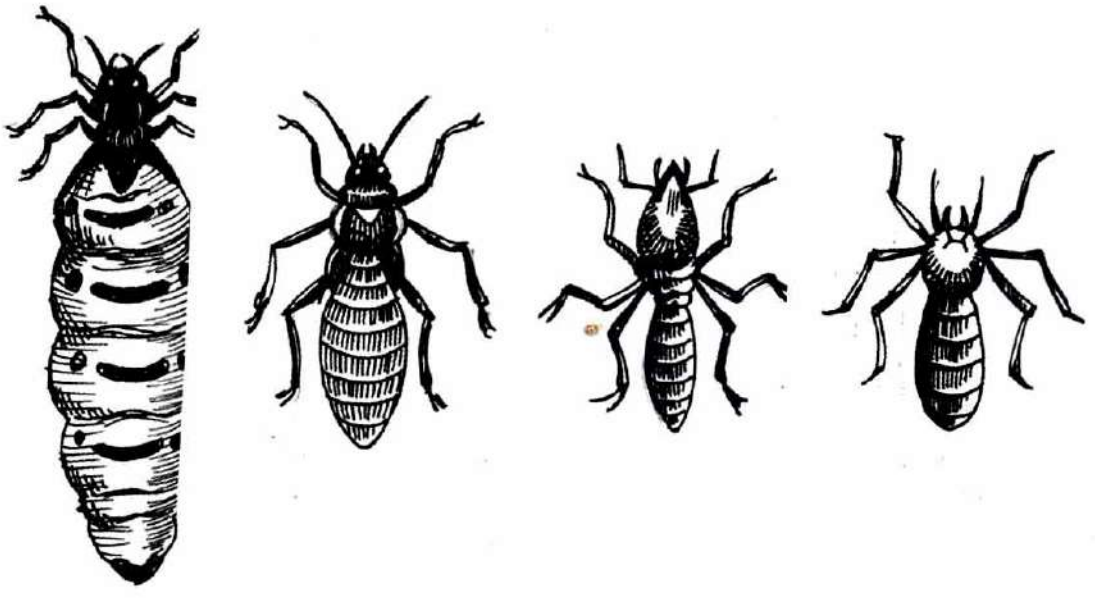

কংক্রিটের ফাটল। মাটিতে কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে ভিত্তি তৈরি করলেও কিন্তু বাড়ি নিরাপদ নয়। ঐ কংক্রিটে যেসব ফাটল দেখা দেয় তার মধ্য দিয়ে উই এসে বাড়ির কাঠের অংশে আঘাত হানতে পারে।

লিক-করা পানির পাইপ। যেখানে পানির পাইপের জোড়ার বা পানির কলের গোড়ায় লিক করে সবসময় ভেজা থাকে তার আশেপাশে উইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার কোনো অভাব হয় না। এরকম পানি নিষ্কাশনের পাইপে ফাটল থাকলেও সেখানে উইরাজ্য গড়ে উঠতে পারে।

বদ্ধ জায়গা। যেসব জায়গায় বায়ু চলাচল করতে পারে না, ঘরের যেসব অংশে সহজে আর্দ্রতা জমে উঠতে পারে তা উইয়ের জন্য প্রশস্ত। ঘরের সর্বত্র, সব কোনায় যেন বায়ু-চলাচল ভালো থাকে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কাঠের সিঁড়ি। বাইরে থেকে বাড়িতে ওঠার সিঁড়ি যদি কাঠের হয়, তা হলে সেই সিঁড়ি উইয়ের জন্যও বাড়িতে আসার চমৎকার সিঁড়ির কাজ করে। এক্ষেত্রে সিঁড়ির তলায় কংক্রিটের ভিত্তি থাকা চাই এবং সেখানকার মাটিও শোধিত করে নিতে হবে।

উইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে তা নিয়ে ভাবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল বাড়ি তৈরির বা খুঁটি পোঁতার আগেই। তখন প্রয়োজনীয় স্থানের মাটি উপযুক্ত কীটনাশক দিয়ে মিশিয়ে নিলে ওখান থেকে উইয়ের উপদ্রব আর হতে পারবে না। সাধারণত এরকম সর্বিক প্রক্রিয়ার মানে হল বাড়ির বাইরের কিনারার নিচের এবং কাছের মাটির রাসায়নিক শোধন। এটি একটু ব্যয়সাপেক্ষ হলেও শেষ পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে নিশ্চিত পন্থা। পয়ঃপ্রণালীর মুখ, নালা প্রভৃতির আশেপাশেও এরকম কীটনাশক মেশানো প্রয়োজন।

দৌড়, ভোঁ দৌড়

মনে করো, বিরাট এক দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অলিম্পিকে একশো মিটার দৌড়ে গেলবার যিনি প্রথম হলেন তাঁকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে ওখানে। অবশ্য এবার তিনি দৌড়াচ্ছেন অন্য সব মানুষ-দৌড়বিদের সাথে পাল্লা দিয়ে নয়—জলে, স্থলে, আকাশে যত জীবজন্তু রয়েছে সবার মধ্যে এই প্রতিযোগিতা। ক্ষিপ্র বাজ, মহাকায় হাতি, বুদ্ধিমান ডলফিন অথবা পোকা-মাকড় মাছি কেউই বাদ নেই এই প্রতিযোগিতা থেকে। মনে করো, এরকম মজার একটা দৌড়ের ধারাবিবরণী দেয়ার দায়িত্ব তোমার। কেমন হবে সেই বিবরণী?

প্রথমে জলে-স্থলে সবার আগে থাকবে অত্যন্ত দ্রুতগতি চিতাবাঘ—ঘণ্টায় প্রায় সত্তর মাইল বেগে সে এগুবে। আকাশে অবশ্য দু'একটা পাখি তার চেয়ে এগিয়ে থাকবে। এর মধ্যে বাজ আর ইন্ডিয়ান সুইফ্‌ট নব্বই থেকে একশো মাইল বেগে এগিয়ে যাবে। এদের ঠিক পেছনে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে উড়বে সোনালি ঈগল পাখি। তার পরেই ডাঙায় চিতা।

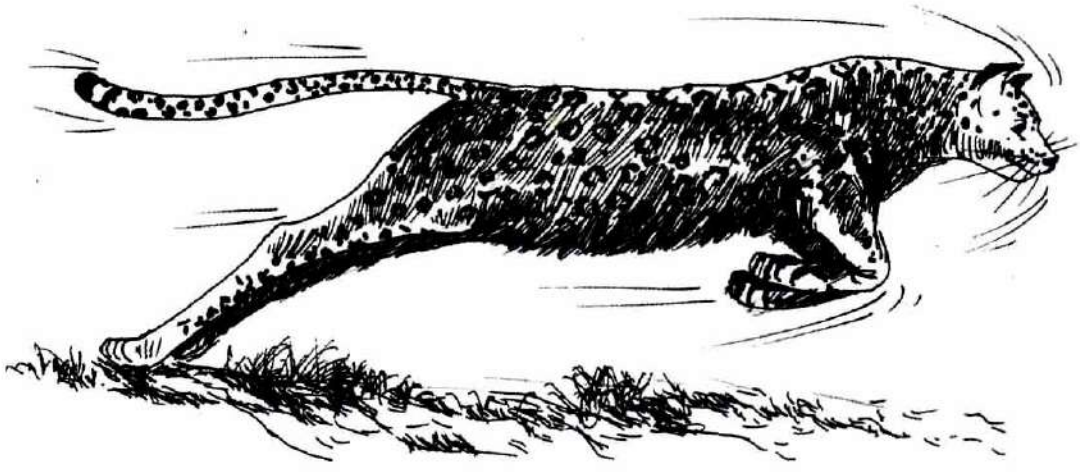

মাটিতে চিতার প্রাধান্য অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। সে প্রথমে জোরেসোরে দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়বে। তখন তাকে টেক্কা দেবে মঙ্গোলিয়ার মরুভূমির জীব গাজেলা। ঘণ্টায় ষাট মাইলের মতো বেগে দৌড়ালেও ওভাবে সে অনেকক্ষণ দৌড়তে পারে। খাটো শরীর কিন্তু লম্বা পায়ের কারণেই গাজেলা এটা পারে।

ডাঙায় তো চিতাকে আর গাজেলাকে আগে যেতে দেখলাম। ওদের কাছাকাছি যারা রয়েছে তারা কিন্তু আকাশে। কানাডা হাঁস, ক্যানভাস ব্যাক পাখি ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইলের মতো বেগে যাবে। আমাদের অতিপরিচিত কাকেরও এখানে খানিকটা বাহাদুরি আছে, সেও এগোবে পঞ্চাশ মাইলের ওপর বেগে। ওদের ঠিক পেছনে আকাশে যারা আছে তার মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটা পতঙ্গ—গঙ্গাফড়িং। আর মাটিতে এরকম বেগে দৌড়বে যে সেও কিন্তু একটা পাখি—উড়তে না পারলেও বিরাট উটপাখি পঞ্চাশের কাছাকাছি বেগে দৌড়তে পারে।

যার দৌড়ের আমরা এত বড়াই করি সেই ঘোড়াকে কিন্তু এসব অগ্রবর্তীদের দলে দেখা যায়নি। তাকে এবার দেখব। কিন্তু তার আগে ডাঙা আর আকাশ ছেড়ে আমাদেরকে পানির দিকে নজর দিতে হবে। কারণ, সেখানে এখন মহাবিক্রমে এগিয়ে চলেছে জলজ প্রাণীর মধ্যে দ্রুততম—সেইলফিশ। স্বনামধন্য এই পালতোলা মাছ বড়সড় একটা খাড়া পাল তুলে সাঁতরিয়ে মানে প্রায় উড়ে চলেছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের বেশি বেগে। ঘোড়া, খরগোশ, লাল শেয়াল—এরা আরেকটু পিছে প্রায় এক কাতারে। অবশ্য ঘোড়ার পিঠে সওয়ার থাকা চাই। কারণ পিঠের উপর বসে কেউ ডাক দোহাই না দিলে ঘোড়া অত বেগে চলতে পারে না।

বাজি রেখে ঘোড়ার যেরকম দৌড় হয়, তেমনি গ্রেহাউন্ড কুকুরেরও দৌড় হয়। দৌড়ে তার স্থান ঘোড়ার ঠিক পেছনে। এদের পেছনে ছুটবে বন্য শুয়োর, এমুপাখি, বেড়াল ; এমন বিদঘুটে গলা যেই জিরাফের সেও কিন্তু এই দলে—সবার বেগ ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বা তারও ওপরে। এর মধ্যে অবশ্য সমুদ্রে উড়ুক্কু মাছ আর টারপন ও টুনা মাছ এগিয়ে যাবে তিরিশেরও বেশি বেগে। আকাশেও আরো দু'চারটা পাখি এগিয়ে থাকবে।

কিন্তু আমাদের অলিম্পিক দৌড়বিদের কী খবর? যিনি ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেছেন? না, এ পর্যন্ত তাঁকে আমরা দেখিনি। এবার দেখব তিনি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে সেয়ানে-সেয়ানে দৌড়াচ্ছে আকাশে পেলিকান বক আর পানিতে ট্রাউট ও ডলফিন। ডাঙায় তাঁর ঠিক আগে মহাকায় বাইসন, ঠিক পেছনে উট। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ঘণ্টায় বিশ মাইলের ওপর এই গতি আমাদের অলিম্পিক বিজয়ী বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারবেন। তিনি একশো মিটার স্প্রিন্টে দৌড়াচ্ছেন—অল্প দূরত্বের জন্য এই গতি। দূরপাল্লার দৌড়ে মানুষ এত জোরে দৌড়তে পারবে না।

আমাদের অলিম্পিক বীর যখন কোনোরকমে এগিয়ে গেছেন এবার আমরা নিশ্চিন্তে বাকিদেরকে গদাইলশকরি চালের জীব বলতে পারি। ওদের মধ্যে হাতির থাকাটা অবশ্য স্বাভাবিক। এতবড় দেহ নিয়েও সে যে ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে দৌড়তে পারে তা-ই তো বেশি! ভেড়া, ইঁদুর এরাও এই একই দলে—অনেক হালকা হয়েও। আকাশে বাদুড় মৌমাছি এরা বেশি কাজের নয়। এদের দৌড়ও ঐ দশ মাইলের কিছু বেশি বা কম বেগের।

পানিতে সাঁতার প্রতিযোগিতাটাও দেখা যাক কেমন এগোচ্ছে। বেশির ভাগ মাছ ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছে। দশ থেকে বিশ মাইল বেগের মাঝখানে আমরা পেঙ্গুইন, সবুজ কাছিম, তিমি এদেরকেও দেখছি সাঁতরাতে। কিন্তু মানুষ? সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষ-সাঁতারুও কিন্তু এদের অনেক পেছনে। দশ মাইলেরও কম পানিতে তার বেগ বলতে গেলে প্রায় সবার পেছনে। পানিতে তার পেছনে কি কেউ আছে? আছে বইকী ! কেন, চিংড়ি?

আর মাটিতে পা-পা করে সবার পেছনে কে এগোচ্ছে? আরে কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প কি ভুলে গেছ? গল্পের কচ্ছপ পণ্ডিতি করে বলে বটে যে ধীর ও সুস্থিরগতি দৌড়ে বিজয়ী হয়—তবে সে নিজে এই দৌড়ে শিরোপা পাবে বিজয়ী হিসেবে নয়, সবচেয়ে ধীরগতির জীব হিসেবে।